ভেতরে

কষ্টার্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ২
২৮ জুলাই-এর আহ্বান ৩
চা শিল্পে অনাহারে মৃত্যু ৪
২০১৪-১৫ কেন্দ্রীয় বাজেট ৫
অভিনন্দন বার্তা—শুভেচ্ছা বার্তা ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ২২ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৭ জুলাই ২০১৪

মোদী সরকারের জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে

রাজ্যের জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

মোদী সরকারের জনবিরোধী রেল বাজেট ও বাজেটের বিরুদ্ধে গত ১০ জুলাই কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় সি পি আই (এম এল) লিবারেশন-এর কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। বিক্ষোভ মিছিল যাওয়ার কথা ছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার দিকে। কিন্তু শুরু করার সময়ই মিছিলের গতিরোধ করে পুলিশ, আগাম অনুমতি না থাকার অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ বলে মিছিল ধর্মতলার দিকে যেতে পারবে না, যেতে হলে কলেজ স্কোয়ারের দিকে যেতে পারে। প্রত্যুত্তরে পুলিশের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে মিছিল শুরু করতে গেলে পুলিশ ফের মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে। তখন সি পি আই (এম এল) নেতা-কর্মী সকলে সাহসের সাথে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে মিছিল শুরু করে দেন। মিছিল এগোতে থাকে মৌলালীর দিকে। শ্লোগান ওঠে—রেল বাজেটে যাত্রী ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, রেলকে এফ ডি আই-এর হাতে, সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোকে কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি 'সুদিন'-এর প্রকৃত স্বরূপ দূর্দিন যেভাবে চাপিয়ে দেওয়া শুরু হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনগণকে সোচ্চার হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তেলার আহ্বান রাখা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, রাজ্য কমিটি সদস্য বাসুদেব বোস, অতনু চক্রবর্তী, কলকাতা জেলা সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদক সুব্রত সেনগুপ্ত, হাওড়া জেলা সম্পাদক দেবব্রত ভক্ত, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদক কিশোর সরকার, কলকাতা জেলা কমিটি সদস্য দিবাকর ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী দত্ত প্রমুখ। মিছিল মৌলালীর মোড়ে পৌঁছানোর পর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতে থাকে। পার্থ ঘোষ এই বিক্ষোভ কর্মসূচীর রাজনৈতিক সারবস্তু তাঁর বক্তব্যে সংক্ষেপে রাখেন, পথচলায় থমকে দাঁড়ানো মানুষজন সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। বক্তব্য শেষ হওয়ার পর মোদী সরকারের রেল বাজেট ও বাজেটের কপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শিলিগুড়িতে পার্টির দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে মোদী সরকারের জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে এক শ্লোগানমুখর মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন ভালোসংখ্যায় কৃষক পুরুষ ও মহিলা, ক্ষেতমজুর, চা-শ্রমিক, শহরের মধ্যবিত্ত, ছাত্র ও যুব বাহিনী। মিছিল শেষে স্থানীয় হাসমি চকে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। এই বিক্ষোভ

দুয়ের পাতায় দেখুন

গাজায় ইজরায়েলি বিধ্বংসী হামলার বিরুদ্ধে

কলকাতায় ও শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ

গাজার উপর ইজরায়েলী বিমান ও নৌ বাহিনীর নির্বিচারে বোমাবর্ষণে প্যালেস্তিনীয় নাগরিকদের গণহত্যার করার বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন ১৬ জুলাই দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচীর আহ্বান রাখে। সেই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে ঐদিন কলকাতায় তপসিয়ার কাছে ইজরায়েলী কনস্যুলেটের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচী সংগঠিত করা হয়। ঐ কর্মসূচীতে সি পি আই (এম এল) নেতা-কর্মীবৃন্দ সহ আরও অংশগ্রহণ করেন সদ্য গঠিত "গণমঞ্চ" -র নেতা রেজ্জাক মোল্লা ও প্রসেনজিৎ বোস এবং "ইন্ডিয়ানস্ ফর গাজা" নামক সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধি। প্রতিবাদী মিছিল তপসিয়া মোড় থেকে শুরু হয়ে ইজরায়েলী কনস্যুলেট ভবনের সামনে সমবেত হয়। বিক্ষোভ মিছিল থেকে শ্লোগান ওঠে গাজায় ইজরায়েলী আক্রমণের বিরুদ্ধে, ইজরায়েলী আগ্রাসনে আমেরিকার মদত দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং ভারত সরকারের নীরবতার বিরুদ্ধে। কনস্যুলেটের সামনে সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) রাজ সম্পাদক পার্থ ঘোষ, গণমঞ্চের পক্ষ থেকে রেজ্জাক মোল্লা ও প্রসেনজিৎ বোস

কলকাতার তপসিয়া অঞ্চলে ইজরায়েল কনস্যুলেট অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল চলেছে।
সামনে পার্থ ঘোষ, প্রসেনজিৎ বোস, রেজ্জাক মোল্লা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আলোকচিত্র ঃ অরূপ পাল

এবং ইন্ডিয়ানস্ ফর গাজা সংগঠনের এক প্রতিনিধি। সকল বক্তাই গাজার উপর ইজরায়েলী হামলা ও গণহত্যালীলা চালানো অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানান। তাঁরা ইজরায়েলী আক্রমণে মার্কিন মদতের তীব্র সমালোচনা করেন। গাজার নিরীহ প্যালেস্তিনীয় জনগণের প্রতি ইজরায়েলের সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে ভারতের মোদী সরকার কোন ধরণের নিন্দা ও প্রতিবাদ না জানানোর তীব্র সমালোচনা করে তাঁরা দাবি জানান— ভারত সরকারকে এই সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে, ইজরায়েলের থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনা বন্ধ করতে হবে, ইজরায়েল থেকে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করতে হবে।

এদিন শিলিগুড়ি শহরের হাসমিচকেও সি পি আই (এম এল) দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ইজরায়েলী আগ্রাসন বিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতা নিহাউ-র কুশপুতুল পোড়ানো হয় জনপথে। নেতৃত্ব দেন পার্টির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার, রাজ্য নেতা বাসুদেব বোস, জেলা নেতা মোজাম্মেল হক, অপু চতুর্বেদী প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গে নতুন রাজ্যপাল হিসেবে আসছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে কেশরীনাথ ত্রিপাটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রথম বিদেশ সফরের প্রাক্কালে কেশরীনাথকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিয়োগাদেশ দিয়ে গেলেন। চারটি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ হবে পশ্চিমবঙ্গ সহ।

চারটি রাজ্যের মধ্যে গুজরাট ও ছত্তিশগড় রাজ্য সরকারের সাথে কেন্দ্রের মোদী-সরকারের কি মতামত আদান-প্রদান হয়েছে সে একমাত্র তারাই জানেন, ঐ রাজ্য দুটিতে রয়েছে বিজেপি সরকারই। বাকী দুটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় সমাজবাদী দলের অখিলেশ যাদব সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা সরকার।

উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ সরকারের প্রতি তথাকথিত আলোচনার সৌজন্য প্রদর্শনের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী অফিস কোন আগ্রহ দেখায়নি। সেখানে কেন্দ্র কাকে রাজ্যপাল নিয়োগ করবে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেটাই ছিল অনিবার্য। যদিও উত্তরপ্রদেশে গত লোকসভা নির্বাচনে ভোটের বিশাল ফায়দা লুঠতে বিজেপি-আর এস এস সমন্বিত সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী শক্তিকে অবাধ ছাড় দিয়েছিল অখিলেশ প্রশাসন। একদিকে রাজনীতির খুল্লামখুল্লা সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটানো, তার ভিত্তিতে সামাজিক শক্তিগুলোর প্রতিষ্ঠিত সব ভারসাম্যকে ভেঙ্গে নতুন সামাজিকীকরণের আবহ-উন্মত্ততা তৈরী করা এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার রক্তগঙ্গা বইয়ে গেরুয়া শক্তির সপক্ষে ভোটের রাজনৈতিক মেরুকরণকে তুঙ্গে তোলা—এসব কোনো কিছুতেই মুলায়মের সমাজবাদী দলের ও অখিলেশ প্রশাসনের ন্যূনতম বাধা ছিল না। আর এখন সেখানে রাজ্যপাল নিয়োগের প্রশ্নে অখিলেশ সরকারের মতামতের অস্তিত্বকে স্বাভাবিকভাবেই মোদী সম্প্রদায় উপেক্ষা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিজেপির বিশেষ লক্ষ্য হল সামনে বেশ কটি পৌরসভা নির্বাচন, আর দু-বছর বাদে আগামী বিধানসভা নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে ওপর থেকে এবং নিচের দিক থেকে দ্বিমুখী চাপসৃষ্টিই হবে বিজেপির আশু কৌশল। আর এই লক্ষ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেই বিজেপি নতুন রাজ্যপাল নিয়োগের সুযোগটা কাজে লাগাতে চায়। এই চাওয়া থেকেই কেশরী নাথের মনোনয়ন। না, মমতা সরকারের সাথে বিশেষ আলোচনার, এই সরকারের থেকে মতামত নেওয়ার, রাজ্য সরকারের পছন্দ অনুযায়ী পদক্ষেপ করার কোনোটাই কেন্দ্র করেনি। তৃণমূল কংগ্রেসও সেই টানাপোড়েনের পরিস্থিতি তৈরী করে হল্লা ওঠানোর কৌশল নিতে চায়নি। কেশরীনাথকে পাঠানোর উদ্দেশ্যে বুঝলেও তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা সরকার নির্বিবাদেই তাঁর নিয়োগ মেনে নিয়েছে।

এই রাজ্যপাল পদ প্রথাটিকে ঔপনিবেশিক আমলে অনুসৃত প্রথাসমূহের এক অবশেষ হিসেবে আজও রেখে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানগতভাবে এই পদটিতে একতরফা প্রতিনিধি মনোনীত করার মালিক হল কেন্দ্র। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভাষণ হিসেবে যা প্রচারিত হয় তা রাজ্য সরকারেরই বক্তব্য। রাজ্যপাল এক নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের ভাষণ দিচ্ছেন বা অবস্থান গ্রহণ করছেন, এমনটি সাধারণত রীতি হিসেবে নেই, দেখা যায় না, হওয়ারও নয়। কেন্দ্রের ও রাজ্যের সরকারদ্বয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ শোনা, গ্রহণ করা, যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ক্ষমতা যদিও রাজ্যপালের রয়েছে, কিন্তু তার কার্যকরি কোন ফলিত উপযোগিতা সচরাচর মেলার নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আলোড়নের পর্বে তদানীন্তন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীর যে সময়োচিত বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, বিশেষত সিঙ্গুরের জমিজট ছাড়ানোর জন্য যে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নজর কেড়েছিল তা ছিল অবশ্যই এক ব্যতিক্রম চরিত্রের প্রশংসনীয়। এরকম ব্যতিক্রম নজীর হয়তো বাকী ভূ-ভারতে আরও দু-একটি থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে রাজ্যপালের অফিস কেন্দ্রের অফিসের হয়েই কাজ করে। এরাজ্যে যে কেশরীনাথকে রাজ্যপাল করে পাঠানো হচ্ছে তাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসই বুঝিয়ে দেয় তিনি আর এস এস এবং আজকের বিজেপির মোদী সংস্করণের জবরদস্ত প্রতিনিধি।

শাসক তৃণমূলের সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যদি 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের' নামে বিজেপি সমাজ ও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকীকরণের বিষ ছড়ানোর কৌশল নেয় এবং কেশরীনাথ অবতীর্ণ হন চোখ-কান খোলা ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় তাহলে পরিণাম গড়াবে মারাত্মক।

কষ্টার্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, বাড়ছে আক্রমণের তীব্রতা

লোকসভার অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে, আর পেশ হতে চলেছে বাজেট। এই সময়ের নানাবিধ কার্যকলাপ থেকে বোঝাই যাচ্ছে ইউ পি এ সরকারের শুরু করা নানাবিধ আক্রমণগুলোকে মোদী সরকার আরও তীব্র করছে। কষ্টার্জিত বিভিন্ন অধিকারগুলো হরণ করা হচ্ছে।

ধরা যাক আধার কার্ডের বিষয়টি। সংসদের অনুমোদন ব্যতিরেকেই ইউ পি এ সরকার এই কার্যক্রমটি নিয়েছিল এবং গোপনীয়তা, নজরদারি, কর্পোরেট জগতের দ্বারা নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার সংক্রান্ত নানা দুর্ভাবনার ওপর স্টিম রোলার চালিয়েই একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিজেপির যশোবন্ত সিনহার নেতৃত্বাধীন এক সংসদীয় কমিটি এই সংশয়গুলোর অনেকগুলোকেই যথাযথ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং ভারতের জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত এই বিলকে বাতিল করে দিয়েছিল। এখন মোদী সরকার সেই আধার-এর বিষয়টি নিয়ে আবার এগোতে চাইছে। মার্চ ২০১৪-র এক নির্দেশে সুপ্রীম কোর্ট জানিয়েছে সরকারি ভর্তুকি প্রদানের জন্য আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করা চলবে না। কিন্তু ভর্তুকি যুক্ত রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডারের জন্য মোদী সরকার আধারকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলছে। স্বয়ং মোদীর নেতৃত্বাধীন একটি বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে সরাসরি অর্থ প্রদানের মাধ্যম হিসেবে আধার কার্ডকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে, সুপ্রীম কোর্টের মার্চ ২০১৪-র নির্দেশনামার পর যাকে বাতিল করে দিতে হয়েছিল।

রাজস্থান সরকারের পথ অনুসরণ করে মোদী সরকার একগুচ্ছ সংস্কারের কথা বলছে। তার একটা গালভরা পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে এটা নাকি 'কর্মসংস্থানমুখী শ্রম আইন সংস্কার'। বাস্তবে এটি হল ছাঁটাই, ব্যাপক শোষণমূলক ঠিকা প্রথাকে আইনি করা এবং কর্মীর অনুকূল শ্রম আইনকে বদলানোর একটি ছক।

রাজস্থান সরকার এন আর ই জি এ প্রকল্পকেও লঘু করার কৌশল নিয়েছে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছেন এন আর ই জি এ-কে একটি আইনে পর্যবসিত করার দরকার কী, এটা একটা প্রকল্প হিসেবে থাকতে পারে। এন আর ই জি এ-র আগেও অনেক গ্রামীণ কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প ছিল, কিন্তু তার কোনও আইনি ভিত্তি নেই। এন আর ই জি এ সম্পর্কে নতুন যে দিকটি উঠে আসছে তা হল সরকারের ওপর বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান দেওয়ার আইনি চাপটিকে নিতে ইউ পি এ সরকার অনাগ্রহী ছিল। আর দেশজোড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারও এটির রূপায়ণের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছে। কিন্তু এন আর ই জি এ গ্রামীণ গরিবদের কাজের বৈধ দাবিতে আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেছে। এখন মোদী সরকার এর আইনি দাবি থেকে সরতে চাইছে।

ইউ পি এ সরকারের করা জমি অধিগ্রহণ নীতিতে অনেক ফাঁক-ফোকর আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গণআন্দোলন জমি গ্রাসে কিছুটা লাগাম পরাতে সক্ষম হয়েছিল। এখন মোদী সরকার জমি অধিগ্রহণ আইনটিকে লঘু করতে চাইছে, বিশেষ করে কৃষকের সম্মতির প্রয়োজনীয়তার দিকটিকে সে বাতিল করতে চাইছে।

গ্রামীণ দারিদ্রের পরিমাপের ক্ষেত্রে দৈনিক ৩২ টাকা খরচের মানদণ্ড তৈরি করতে চাইছে মোদী সরকার আর শহরের ক্ষেত্রে এটা করতে চাইছে ৪৭ টাকা। গ্রামীণ ও শহুরে দারিদ্রসীমা নির্ধারণের এই মানদণ্ডটিই আশ্চর্যজনক। কারণ এর মধ্যে দিয়ে সত্যিই দরিদ্র এরকম অসংখ্য মানুষকে ছেঁটে ফেলা হয়। একদিকে সরকার যখন নির্লজ্জভাবে গরিবদের ওপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জনগণের দারিদ্র্যকেও স্বীকার করতে চাইছে না।

সংসদে শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের অনুপস্থিতির সুযোগে মোদী সরকার যেমন আগ্রাসী কর্পোরেট প্রীতি প্রকাশ করছে, তেমনি অন্যদিকে জনস্বার্থবাহী বিভিন্ন ভর্তুকি এবং অধিকারকে হরণ করতে চাইছে। কিন্তু অতীতেও সংসদীয় বিরোধীপক্ষ জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকের সুরক্ষা বা শ্রমিকের আইনি রক্ষাকবচ বা দরিদ্র ও সাধারণ জনগণের নানাবিধ অধিকারের দিকগুলো নিয়ে সামান্য কিছুই করেছে। রাস্তায় নামা জনগণের প্রতিবাদ আন্দোলনকেই চলমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে হবে। মোদী সরকার জনগণের ক্ষমতায়নের আকাঙ্খাকে ব্যবহার করেই ক্ষমতায় এসেছে, তারা যখন যন্ত্রণার উপশম ও অধিকার চাইছে তখন তাকে কিছুতেই এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ দেওয়া যাবে না। মোদী সরকার যখন 'আচ্ছে দিন'-এর ধারণার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তখন রাস্তায় শোনা যাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি ও জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, জীবিকার আইনি অধিকার ও শ্রম আইনকে লঘু করা নয় তাকে শক্তিশালী করার দাবিতে জনতার রণহুঙ্কার।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৮ জুলাই ২০১৪)

... বাজেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ...

একের পাতার পর

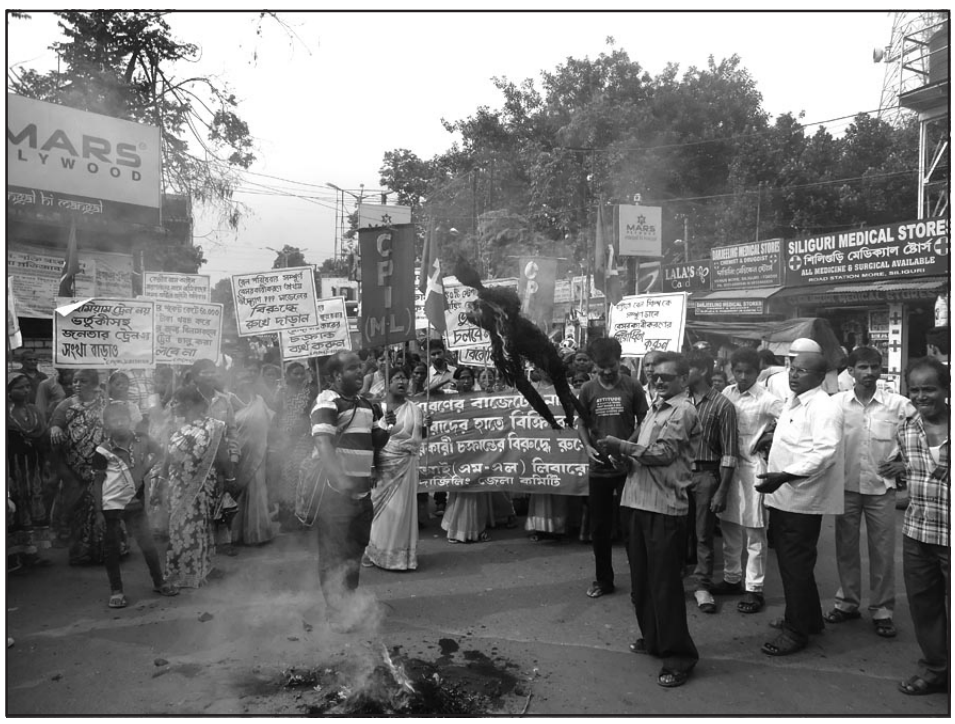

শিলিগুড়ির হাসমিচকে বিক্ষোভ মিছিল শেষে জনবিরোধী বাজেটের প্রতিবাদে মোদীর কুশপুতুল পুড়ছে

কর্মসূচীর নেতৃত্বে ছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার, জেলা নেতা পবিত্র সিংহ, মোজাম্মেল হক, অপু চতুর্বেদী, লালু ওরাওঁ, কান্দ্রা মুর্মু, লালদেও রাউতিয়া, নেত্রী মীরা চতুর্বেদী, রুবী সেনগুপ্ত, ছাত্র নেতা প্রদীপন গাঙ্গুলী, শাশ্বতী সেনগুপ্ত, যুব নেতা প্রলয় চতুর্বেদী প্রমুখ।

একই দিনে মালদহের গাজোলে রাস্তা অবরোধ করে মোদীর কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচী নেওয়া হয় উত্তর চব্বিশ পরগণার চাঁদপাড়া অঞ্চলে।

১২ জুলাই পার্টির হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা সদর চুঁচুড়ায় বিক্ষোভ কর্মসূচী সংঘটিত হয়। জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার ও জেলা কমিটি সদস্য স্বপন গুহের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল শহরের ঘড়ি মোড় থেকে শুরু হয়ে বাস স্ট্যান্ড এলাকা পরিক্রমা করে। বাজেটের প্রতিরূপ পোড়ানো হয়। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ২১-২২ লাইনে পড়তে হবে ... ''তবু তাপস সংসদে গেলে তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস সহ তিনি আরও নাজেহাল হতেন।

সত্বর সংগ্রহ করুন

চারু মজুমদার এবং তাঁর উত্তরাধিকার

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

২৮ জুলাই ২০১৪ ঃ সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান

মোদী জমানার কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পার্টির বিস্তার ঘটান, পার্টিকে শক্তিশালী করুন

২৮ জুলাই, ২০১৪ হল আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতা কমরেড চারু মজুমদারের শহীদ হওয়ার ৪২তম বার্ষিকী। এই দিনটি হল ১৯৭০-এর গোড়ায় ধাক্কা খাওয়ার পর আমাদের পার্টির পুনর্গঠনের ৪০তম বার্ষিকী। আমরা এই প্রথম কেন্দ্রের এমন এক সরকারের সম্মুখীন যেখানে বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং যে সরকারটি তার প্রথম দু-মাসের ক্ষমতায় সংশয়াতীতভাবেই নিজের আপাদমস্তক কর্পোরেটমুখী এজেণ্ডা ও সাম্প্রদায়িক কর্তৃত্ববাদী চরিত্রকে বেআব্রু করেছে। আর এই প্রসঙ্গেই কমরেড চারু মজুমদারের শেষ কথা এবং ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র গোড়ায় ইন্দিরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রক্রিয়ায় অর্জিত শিক্ষাগুলো আমাদের মনে পড়ছে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও 'গরিবি হঠাও'-এর আবেদনে সওয়ার হয়ে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্বকে পরাস্ত করে সুস্পষ্ট জনাদেশ পেয়েছিলেন। তারপর বাংলাদেশ যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করে তিনি তাঁর ক্ষমতাকে সংহত করার পথে পা বাড়ালেন। এর ফলে আর এস এস এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে বাজপেয়ী ইন্দিরা গান্ধীকে মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করে বসলেন। দ্রুতই এই 'গরিবি হঠাও'-র জনাদেশ এবং জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি কীভাবে আধা সামরিক বাহিনী মারফত সি পি আই (এম এল)-এর উপর বর্বর দমন-পীড়ন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে নিকেষ করে তমসাচ্ছন্ন জরুরী অবস্থা জারী করার দিকে এগোল, ইতিহাসই তার সাক্ষী হিসাবে রয়েছে।

কমরেড চারু মজুমদার আগেভাগেই এই বিপদের সংকেত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করার আগেই জনগণের উপর নেমে আসা এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্যের আহ্বান রেখেছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন যে, জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ। ২৮ জুলাই ১৯৭৪-এ পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির পুনর্গঠন এবং পরবর্তীতে পার্টির পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ায় কমরেড চারু মজুমদারের সেই শেষ আহ্বানকে উর্ধ্বে তুলে ধরে কৃষক জাগরণের ঢেউ, সর্বাত্মক গণউদ্যোগ এবং বৈপ্লবিক সামাজিক রূপান্তর সাধন ও অবিচল গণতন্ত্রের এজেণ্ডাকে জোরালোভাবে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া হয়। পুনরুজ্জীবিত সি পি আই (এম এল) সফলভাবেই শাসকশ্রেণীর স্বৈরাচারী আক্রমণকে রুখে দেয়, তিলে তিলে এমনই এক দায়বদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলে যে জনগণের স্বার্থ ও সংগ্রামের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

চার দশক আগেকার ঐ পরিস্থিতির সঙ্গে, বর্তমান সময়েরও রয়েছে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। ইন্দিরা গান্ধী পুরোপুরি বামপন্থার ভেক ও সমাজতান্ত্রিক শ্লোগান নিয়ে চলতেন। আর নরেন্দ্র মোদী তার দক্ষিণমুখী নীতি ও কর্পোরেটের সঙ্গে নিবিড় সখ্যতা সম্পর্কে বড় বেশি বড়াই করে চলেন। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সি পি আই (এম এল)-এর শোকগাথা লিখতে। আর মোদীর 'কংগ্রেস-মুক্ত-ভারতবর্ষ' গড়ার লক্ষ্য হল বিজেপির একমেবদ্বিতীয়ম নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী আধিপত্যবাদকে প্রতিষ্ঠা ও সংহত করা। সমস্ত ধরণের বাম শক্তির হাত থেকেই ভারতকে মুক্ত করার আকাঙ্খায় তিনি এমনকি হরেকরকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অ-বাম উদারনৈতিক ধারাগুলোকেও এই প্রক্রিয়ায় ঠেলে দিতে চাইছেন প্রান্তসীমায়।

ঠিক যেমন ইন্দিরা গান্ধী শক্ত হাতে শাসন করতে চাইতেন তাঁর অতি বিশ্বস্ত ছোট এক চক্রের মাধ্যমে, মোদীও অনুরূপে, অবিসংবাদী এক নেতা হিসাবে শাসন করতে চাইবেন তার চারপাশের ভক্তদের নির্লজ্জ চাটুকারিতা এবং সহকর্মীদের অনুগত্যের ভিত্তিতে। আর নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই দুই নেতা-নেত্রীর ক্ষেত্রেই উগ্রজাতীয়তাবাদী বাকসর্বস্বতা রয়েছে কেন্দ্রবিন্দুতে। ইন্দিরার উত্থান যদি হয়ে থাকে 'জাতীয় ঐক্য সংহতি' এবং সরকারিভাবে ঘোষিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র উপর দাঁড়িয়ে, তবে মোদীর জাতীয়তাবাদ হচ্ছে খোলাখুলি সংখ্যাগরিষ্ঠবাদের পক্ষে। মূলত অভিঘাত থাকছে কঠোর রাষ্ট্রের প্রতি, যা 'জাতীয় নিরাপত্তা'-র নামে এবং কর্পোরেট পরিচালিত উন্নয়নশীলতার স্বার্থে অধিকারগুলোকে হরণ করবে, চূর্ণ করবে যে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আর্থিক সমৃদ্ধির অজুহাত তুলে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধন করবে এবং জনগণের জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনবে।

এই ক্রমবর্ধমান দক্ষিণপন্থী হামলা ও কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটাই আমাদের কাজ। বামপন্থীদের অপাংক্তেয় করার যে বিজয়োল্লাস চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সমুচিত জবাব দিতে হবে। আর এই চ্যালেঞ্জটা হাতে নিতে হলে, জনগণের গভীরে আমাদের যেতে হবে, দৈনন্দিন নানা ইস্যুতে তাঁদের সংগঠিত ও সামিল করাতে হবে। ক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারের সময়ে বিজেপি জনগণের মধ্যে যে আশা-আকাঙ্খা জাগিয়েছিল তা ওদের বিরুদ্ধেই ঘোরাতে হবে। আজ বিজেপির কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক এজেণ্ডার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধির নির্মম বাস্তবতা এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো ক্রমেই পরিণত হচ্ছে তামাশায়। যখন 'সুদিন'-এর শ্লোগান বাস্তব জীবনে 'দুর্দিন'-এ পর্যবসিত হবে মানুষ তখন রুখে দাঁড়াবে। আর জনগণের সেই সমস্ত আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে সি পি আই (এম এল) নিজের ভূমিকা পালন করবে।

মোদী সরকার যখন তার কর্তৃত্ববাদী ধরণের শাসনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, চাপিয়ে দিতে চাইছে তার কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক এজেণ্ডা, তখন চারপাশ থেকে মোহভঙ্গ ও অসন্তোষের আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যেমন অনুযোগ করতে শুরু করেছেন, ভারতের প্রধান বিচারপতিও তেমনি বিচারপতি নিয়োগের প্রশ্নে সরকারের নাক গলানোর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। সমস্ত কোণ থেকেই উঠছে প্রতিবাদের আওয়াজ। এখন এই হল সময়, যখন নানান ধরনের লড়াকু শক্তির মধ্যে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে, গড়ে তুলতে হবে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্য ব্যাপকতম ঐক্য।

আজ সংসদের অভ্যন্তরে বিরোধীপক্ষ দৃশ্যতই বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। জনগণের অধিকার ও জীবন-জীবিকা রক্ষার ক্ষেত্রে, দেশের বহুত্ববাদী কাঠামো এবং নানান প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বশাসনকে সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নে বিরোধীপক্ষের বেশিরভাগ অংশটারই আজ আর কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সংসদে বিরোধীদের ভূমিকা যাই থাকুক না কেন, মোদী সরকার যে সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো ছুঁড়ে দিয়েছে, সে ব্যাপারে হরেক প্রতিষ্ঠানগুলো যে ধরনেরই ভূমিকা নিক না কেন, রাস্তায় নেমেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আওয়াজ তুলতে হবে। বিভিন্ন ধরণের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ব্যাপক আন্তক্রিয়া চালানো, নানান দাবিতে জনগণের গড়ে তোলা বহুবিধ সংগ্রামের সঙ্গে কার্যকরী সংহতি ও সহযোগিতাই হল এখন সময়ের দাবি।

আর নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আগের তুলনায় আমাদের শক্তিশালী পার্টি সংগঠন প্রয়োজন। জুলাই ১৯৭৪-এ যখন পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠিত হয়, তখন ধ্বংসস্তুপ থেকেই পার্টি পুনর্গঠনের কাজটি শুরু করা হয় উপর থেকে। আজ ৯টা পার্টি কংগ্রেস সংগঠিত করার পর আমরা অনেকটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি—আমাদের পার্টির সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষেরও বেশি; ২০টা-রও বেশি রাজ্য ও ১০০টি জেলায় রয়েছে আমাদের পার্টি সংগঠন। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচন আবার প্রমাণ করল যে তৃণমূলস্তরে আমাদের আরও কার্যকরী পার্টি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আমাদের গণসংগঠনগুলোর প্রায় ৩০ লক্ষ সংগঠিত গণসদস্য রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত ভোট টেনেটুনে ১০ লক্ষ অতিক্রম করে। এটা স্পষ্টতই আমাদের সদস্য-সমর্থকদের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সমাবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রে দুর্বলতাকেই দেখিয়ে দেয়।

আসল কথা হল, নির্বাচনী সংগ্রামে নির্বাচনী বুথগুলোই হল মূল ক্ষেত্র। গোটা বুথ স্তরেই প্রতিপত্তিশালী শাসকশ্রেণী অর্থবল-পেশীবল-মিডিয়ার প্রভাব ও সামাজিক সমীকরণ ঘটিয়ে ভোটারদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ রকমই এক অসম নির্বাচনী যুদ্ধক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগ্রামে ক্ষমতার ভারসাম্য বিরাটভাবেই গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে ঝুঁকে থাকে। তাই, শাসকশ্রেণীর এই রাজনীতির বিরুদ্ধে তৃণমূলস্তরে নিবিড়ভাবে বিপরীত সমাবেশ ঘটিয়ে নীচুতলায় কার্যকরি প্রতিরোধ গড়ে তোলাটা কমিউনিস্টদের কাছে খুবই জরুরী।

পার্টি গঠনের বছরগুলোতে, সামন্তবাদী আধিপত্য এবং রাষ্ট্রীয় হিংসার বিরুদ্ধে তৃণমূলস্তরের যে সংগঠনগুলো সংগ্রাম চালিয়ে বড়-ধরণের জয় অর্জন করেছে, সেগুলো নির্বাচনী লড়াইয়েও আমাদের কাছে প্রধান অস্ত্র হয়ে থাকবে। এটা মনে রাখা দরকার যে, কংগ্রেস বা অন্যান্য পরিচিতি-ভিত্তিক পার্টিগুলোর বিপরীতে বিজেপি হচ্ছে এক ক্যাডার ভিত্তিক পার্টি, যে প্রচার ও সংগঠনের কাজে এবং তার মতদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কাজে নীচুতলায় গভীর মনোযোগ দেয়। সুতরাং বিজেপিকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের নীচুতলায় সাংগঠনিক-রাজনৈতিক-মতাদর্শগতভাবে সমাবেশ ঘটানোর কাজটি নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে। পার্টি পুনর্গঠনের ৪০তম বার্ষিকীতে নীচুতলার সংগঠনগুলোকে গণভিত্তি, রাজনৈতিক সমাবেশ ও সাংগঠনিক কাজকর্মের দিক থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে আমাদের অঙ্গীকার নিতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের মজবুত কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নির্ণায়ক বিজয় অর্জন করতে হবে, যে কমিউনিস্ট সংগঠন গণসংগ্রামের সমস্ত ফ্রন্টেই বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে গভীর সংযোগ রক্ষা করে চলবে।

> "... পার্টি পুনর্গঠনের ৪০তম বার্ষিকীতে নীচুতলার সংগঠনগুলোকে গণভিত্তি, রাজনৈতিক সমাবেশ ও সাংগঠনিক কাজকর্মের দিক থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে আমাদের অঙ্গীকার নিতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের মজবুত কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নির্ণায়ক বিজয় অর্জন করতে হবে, যে কমিউনিস্ট সংগঠন গণসংগ্রামের সমস্ত ফ্রন্টেই বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে গভীর সংযোগ রক্ষা করে চলবে।"

চা শিল্পে অনাহারে মৃত্যু ঃ একটি পর্যবেক্ষণ

জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বিগত ১১ বছর ধরে বন্ধ, অতি সম্প্রতি এক ভিন রাজ্যের ফাটকা লগ্নিকারীর সুবাদে খুলে যাওয়া রায়পুর চা বাগানে মাত্র ৪ দিনের ব্যবধানে ৬ জন শ্রমিক পরিবারের সদস্যের অনাহারে (সরকারি খাতায় অপুষ্টি ও দীর্ঘকালীন রোগভোগের শিকার) মৃত্যুর খবর সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে প্রকাশ্যে এসেছে। তাপস-অনুব্রত-মনিরুল বিসংবাদের ফাঁকে পাহাড়-ডুয়ার্স তরাইয়ের ২৭৮টি চা বাগানে নিযুক্ত সাড়ে তিন লক্ষ স্থায়ী শ্রমিক ও এই শিল্পের ওপর ভাত-কাপড়ের জন্য নির্ভরশীল ১১ লক্ষাধিক আদিবাসী, গোর্খা মানুষের বারমাস্যা এখন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে বড় খবর। এই সূত্রেই রাজ্যবাসী জেনে ফেলেছেন যে বর্তমানে ৮টি বন্ধ চা বাগানের মধ্যে বিগত ১ বছর সময়কালে অনাহার-অর্ধাহার-মারণরোগ-বুভুক্ষা কবলিত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন রেডব্যাঙ্ক বাগানের ৩১ জন, সুরেন্দ্র নগরে ১৩ জন, বান্দাপানিতে ১৯ জন চা বাগান মজদুর পরিবারের সদস্য। বিগত ১৩ বছর ধরে বন্ধ থাকা ঢেকলাপাড়া চা বাগানে এই সংখ্যাটি ৬০-এর বেশি।

বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব, সংবাদ মাধ্যম ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর এই বন্ধ বাগানগুলোতে অবারিত আনাগোনা কোথাও কোথাও ক্ষুধাপীড়িত শ্রমিকদের বিক্ষোভের সামনে পড়লেও এই তুমুল শোরগোলকে ধামাচাপা দিতে অগত্যা তৃণমূল সরকারের শ্রম-খাদ্য-স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে এখন 'সব দিয়েছি'র ডালি সাজিয়ে হামলে পড়তে হয়েছে সদলবলে। প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছুটছে প্রত্যহ।

এই শিল্পক্ষেত্রে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা এই প্রথম ঘটছে এমনটা নয়। বাগান মালিক গোষ্ঠী সেই ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৭ সাল অবধি চা শিল্পে পুঁজি ও মুনাফার কৃত্রিম সংকটের অজুহাত খাড়া করে নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত, বন্দী শ্রমিকদের স্বোপার্জিত পি এফ-গ্র্যাচুইটির প্রায় ৭০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ১৭টি প্রতিষ্ঠিত বাগান রাতারাতি বন্ধ করে দিয়ে পালিয়ে যায়। ফলত এই বাগানগুলোতে কর্মরত ৬৫ হাজারের অধিক শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা রুজি-রোজগার শুধু নয়, এমনকি বাগিচা আইন অনুযায়ী প্রাপ্য পরিশ্রুত পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পরিমিত খাবার, রেশন, প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসা—এই সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে দলে দলে রুজি-রুটির সন্ধানে বাগান ছেড়েছে। রাজ্যের গণ্ডি ছেড়ে অন্য সব কাজেই অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে তাঁদের বাগান ছাড়তে বাধ্য হন। এবারও যে অংশটি বাগানের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চাইলেন তাঁদের পক্ষে পরিত্যক্ত বাগানের অল্প কিছু চা পাতা তুলে বাজারজাত করা সম্ভব হল না অচিরেই। সংলগ্ন নদীগুলোতে পাথর ভাঙ্গার কাজে হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়েই দিনমানে মাত্র ৩৫ টাকা মজুরিতেই অর্ধাহার-অনাহারেই রয়ে গেলেন। এই সুযোগে কিছু সুযোগ সন্ধানী মৃত্যু ব্যবসায়ী এই বন্ধ বাগানগুলোর পুনরুজ্জীবনের গল্প বলে ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কোথাও একমাস, কোথাও তিনমাস বাগান খুলিয়ে তারপর গা ঢাকা দিল। পি এফ এবং গ্র্যাচুইটির টাকা তছরুপের দায়ে নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক গ্রেপ্তার ও লগ্নিকারীদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার বিধি থাকলেও নির্বাচনী তহবিলে মোটা টাকা অনুদানকারী মালিক-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শাসক দলগুলোর আঁতাতের সুবাদে বিগত বামফ্রন্ট বা অধুনা তৃণমূল সরকার এই অমিত শক্তিধর মালিকগোষ্ঠীকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি। সরকার ও শাসকদলগুলোর সহযোগে পুঁজি ও মুনাফা পাচারের শিলশিলা অব্যাহত থেকেছে সহজেই।

সর্বভারতীয় মানবাধিকার সংগঠন পি ইউ সি এল-এর পক্ষ থেকে ২০০২ সালে সুপ্রীম কোর্টে খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার সুবাদে সর্বোচ্চ আদালত তাঁদের রায়ে উত্তরবঙ্গের ৬২টি রুগ্ন ও বন্ধ চা বাগানগুলোর শ্রমিক পরিবারগুলোর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মিড-ডে মিল, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, আই সি ডি সি সহ ৯টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে অবিলম্বে চালু করতে রাজ্য সরকারকে আদেশ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ এক দশক পেরিয়েও এই প্রকল্পগুলোর সুবিধা থেকে শ্রমিকরা যে আজও অধিকাংশ বঞ্চিত থাকছেন তা তাঁদের বুভুক্ষার কবলে পড়ে জীবনের বিনিময়েই প্রমাণ করতে হচ্ছে।

২০০৭ সাল থেকে ২০১৪ অবধি চা শিল্প মালিকেরা চা পাতার ঊর্ধ্বগামী বাজারদরের সূত্রে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুললেও শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার মানের উন্নয়ন থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ২০১০ সালে সেভ দ্য চিলড্রেন ও ইউনিসেফের আর্থানুকূল্যে রুরাল এইড এণ্ড লাইফ লাইন ফাউণ্ডেশন নামে একটি অসরকারি সংস্থা ডুয়ার্সের ১২টি বন্ধ-রুগ্ন চা বাগানে একটি নিবিড় সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে যে এই বাগানগুলো থেকে অন্যত্র বেশি মজুরির লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন নাম ভাঁড়ানো এজেন্সির মাধ্যমে, আড়কাঠিদের প্ররোচনায় ৩,৫৮৯ জন কিশোর-কিশোরী ও ৩১৭ জন শিশুকে পাচার করা হয়েছে রাজ্যের মধ্যে কলকাতা, শিলিগুড়ি ঘুরিয়ে রাজের বাইরে আসাম, কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা এবং দেশের বাইরে ভুটান, সূদর সৌদি আরবে। চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া বা কোনরকমে পালিয়ে বাগানে ফিরে আসা মেয়েদের দেহ ব্যবসা ও যৌন নিপীড়নের বীভৎসাও বর্ণিত হয়েছে ঐ সমীক্ষায়।

বাগান শ্রমিকদের বুভুক্ষা ও মৃত্যুর প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে সংশোধীয় কমিটি একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। ঐ রিপোর্টে চা শিল্পে উৎপাদনশীলতার হাজারো পরিসংখ্যান হাজির করা হলেও শ্রমিকদের রুগ্ন ও পরিত্যক্ত বাগান ছেড়ে অন্য কাজ খুঁজে নেওয়ার কিছু বাস্তব কারণের কথাও বলা হয়েছে। এরপরেই বন্ধ বাগানের সংখ্যা বাড়তে থাকলে ২০১৩ সালে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ চা শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা বাঁচাতে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করে। এই প্রস্তাবনায় বলা হয় যে দেশের অন্যান্য সংঘটিত শিল্প শ্রমিকদের তুলনায় চা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি সবচাইতে কম। প্রয়োজন ভিত্তিক মজুরির কোথাও লাগু করার সাথে সাথে এই কাউন্সিল সরকার ও মালিকগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেয়।

এতসব প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ থাকলেও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার চা শিল্পে ন্যূনতম মজুরির কথা ঘোষণা এবং বেঁচে থাকার উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির নিরীখে পরিবর্তনশীল মহার্ঘভাতাকে মজুরির সঙ্গে যুক্ত করার কোনও ইতিবাচক উদ্যোগ থেকে বিরত থেকেছে। ২০১১-তে ৩ বছরের জন্য মজুরি চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়েছে ৩১ মার্চ ২০১৪। পরবর্তীতে ৩ বছরের জন্য নতুন মজুরি চুক্তি বিগত ফেব্রুয়ারী-মার্চ ও জুন মাসে অনুষ্ঠিত তিনটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পরেই আজও অমীমাংসিত। মাত্র ৯৫ টাকা হাজিরা ও রেশন, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি সুবিধাগুলোর ক্রমসংকোচন; নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি; অন্যদিকে মালিকের মুনাফা বৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চা শ্রমিকদের প্রয়োজন ভিত্তিক মজুরি আদায়ে তৃণমূল পরিচালিত শ্রমিক সংগঠন ছাড়া বাকী সব ট্রেড ইউনিয়নগুলো একটি যুক্ত সংগ্রাম মঞ্চ গঠন করে লড়াইয়ে জোট বেঁধেছে। কমপক্ষে ৩০০ টাকা দৈনিক মজুরি, সেইসঙ্গে পরিবর্তনশীল মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য বাগিচা আইন বিধিবদ্ধ সুবিধাগুলো সুনিশ্চিত করার দাবি নিয়ে এই যুক্ত মঞ্চ ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে পাহাড় ও সমতলে অধিকাংশ বাগানে গেট মিটিং ও দাবিসনদ পেশ করা, বানারহাট, বাগডোগরায় বড়মাত্রায় শ্রমিক কনভেনশন করে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছে। চতুর্থবারের জন্য আগামী ১৬ জুলাই উত্তরকন্যার মিনি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিতব্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মজুরি সংক্রান্ত দাবির নিষ্পত্তি না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচীর প্রস্তুতি নিয়েছে। এর বাইরে চা শিল্প শ্রমিকদের 'চলমান দুর্ভিক্ষ'র গ্রহণযোগ্য চালচিত্র জাতীয়স্তরে জনসমক্ষে এনে জনমত গঠনের তাগিদে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা ডাঃ বিনায়ক সেনের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ফোরাম ফর পিপল্‌স হেল্‌থ-এর সহযোগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করে যাওয়া অনেকগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃত্ব বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগানগুলোতে শ্রমিকদের পুষ্টির বিজ্ঞানসম্মত মান নির্ণয়ের জন্য বডি মাস ইনডেক্স (বি এম আই) নিরূপণ করতে জোটবদ্ধ হয়ে কাজে নেমেছে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের চা শ্রমিকদের বুভুক্ষা ও অনাহারে মৃত্যুর বাস্তব চিত্র দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয়-রাজ্য সরকার ও শিল্প শ্রমিক গোষ্ঠীর ওপর নিরন্তন চাপ সৃষ্টি করে যাওয়াই শ্রমিকদের সংকটমুক্তির একমাত্র পথ।

- অভিজিৎ মজুমদার

বিগত ৬৬ বছর ধরে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও)-র শ্রম সংক্রান্ত কনভেনশনকে মান্যতা দেয়নি কার স্বার্থে?

রাষ্ট্রসংঘের শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পরিচালিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আই এল ও-র মাধ্যমে। ভারত সরকার এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯১৯) হিসাবে থাকলেও এই সংস্থার দ্বারা গৃহীত অনেক কনভেনশনকেই আজ পর্যন্ত মান্যতা দেয়নি। রাষ্ট্রসংঘের এটি একমাত্র সংস্থা যেখানে প্রতিটি দেশের মালিক, সরকার এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিটি কনভেনশনকে মান্যতা দিতে হয়। মান্যতা দেওয়ার পরে তা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, সে সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিবেদন নিয়মিত আই এল ও-র সংশ্লিষ্ট কমিটিকে দিতে হয়। কোন দেশ মান্যতা দেওয়ার পরেও কনভেনশন লঙ্ঘন করছে এমন অভিযোগ উঠলে (আই এল ও) নির্ধারিত কমিটির নিকট বিশদ রিপোর্ট সরকারকে পাঠাতে হবে। আই এল ও গঠিত তদন্ত কমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে করতে হবে।

২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ১৮৯টি কনভেনশন (প্রথা) ও ২০২টি রেকমেন্ডেশন (সুপারিশ) আই এল ও গ্রহণ করেছে। ভারতের সংবিধানে সংগঠিত হওয়ার অধিকার স্বীকৃত অধিকার হলেও শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলার স্বীকৃতি স্বরূপ কনভেনশন ৮৭ যা আই এল ও ১৯৪৮ সালে গ্রহণ করেছে, ভারত সরকার আজও তার মান্যতা দেয়নি। একইভাবে, সংগঠন গড়ার অধিকার এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন ৯৮ যা আই এল ও-তে ১৯৪৯ সালে গৃহীত হয়েছে, তা ভারত সরকার মান্যতা দেয়নি। উল্লেখ্য, যে দাবিদুটি ভারতের সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ডাকা সারা ভারত ধর্মঘটের দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল।

বুনিয়াদী শ্রম মান (কোর লেবার স্ট্যান্ডার্ডস্)

আই এল ও গৃহীত ১৮৯টি কনভেনশনের মধ্যে ৮টি কনভেনশনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বুনিয়াদী কনভেনশন হিসাবে। অর্থাৎ এই কনভেনশন গ্রহণ ও প্রয়োগের মান্যতার মধ্য দিয়ে সদস্য দেশ বুনিয়াদী শ্রমমানে উন্নীত হয়েছে ধরে নেওয়া হবে। চিহ্নিত ৮টির মধ্যে ৪টি ভারত সরকার মান্যতা দেয়নি। সহজ ভাষায় বলা যায়—আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূল্যায়নের নিরিখে ভারতের শ্রম মান বুনিয়াদী স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। ৮টি চিহ্নিত কনভেনশনগুলো যথাক্রমে, ১) শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা ও সংগঠিত হওয়ার অধিকারের সুরক্ষা, কনভেনশন ৮৭, গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। আজ পর্যন্ত ১৫২টি দেশ মান্যতা দিয়েছে। ২) সংগঠিত হওয়ার এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার, কনভেনশন ৯৮, গৃহীত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। ১৬৩টি দেশ মান্যতা দিয়েছে। ৩) দাস শ্রমিক, ২৯, গৃহীত হয়েছিল ১৯৩০ সালে। ১৭৭টি দেশ মান্যতা দিয়েছে। ৪) দাস শ্রমিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি, কনভেনশন ১০৫, গৃহীত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। ১৭৪টি দেশ মান্যতা দিয়েছে। ৫) ন্যূনতম বয়স, কনভেনশন ১৩৮, গৃহীত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। ১৬৬টি দেশ মান্যতা দিয়েছে। ৬) শিশুশ্রমের নিকৃষ্ট ধরন, কনভেনশন ১৮২, গৃহীত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। ১৭৮টি দেশ মান্যতা দিয়েছে। ৭) সমকাজে সম মজুরী, কনভেনশন ১০০, গৃহীত হয়েছে ১৯৫১ সালে। ১৭১টি দেশ মান্যতা দিয়েছে। ৮) চাকরি ও পেশাগত বৈষম্য, কনভেনশন ১১১, গৃহীত হয়েছে ১৯৫৮ সালে। ১৭২টি দেশ মান্যতা দিয়েছে।

আই এল ও গৃহীত কর্মসূচী

আই এল ও-র শ্রমিকের অধিকারগত আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যুরো (এ সি টি আর এ ভি) ভারতে কনভেনশন নং ৮৭, ৯৮, ১৩৮, ১৮২ মান্যতা দেওয়ার জন্য ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে যুক্ত করে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে নিয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন বডি তৈরী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ে রাজ্য স্তরে একটি জয়েন্ট এ্যাকশন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। উক্ত ফোরামে এ আই সি সি টি ইউ অন্যতম

সাতের পাতায় দেখুন

২০১৪-১৫ কেন্দ্রীয় বাজেট

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

সাধারণ মানুষের ওপর দুর্দশা চাপিয়ে দেওয়া এবং কর্পোরেশনগুলোকে সুবিধা দেওয়ার যে নীতি পূর্ববর্তী দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, মোদী সরকারের প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেটে তারই ধারাবাহিকতা এবং তাকে এমনকি আরও তীব্র করে তুলতেই দেখা গেল।

বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সংস্থাগুলোর বিলগ্নিকরণের দ্বারকে আরও উন্মুক্ত করে দিয়ে তার থেকে ৪৩০০০ কোটি টাকা আয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং প্রতিরক্ষা, বিমা ও ই-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমাকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বাজেটে এম এন আর ই জি এ এবং দরিদ্রতম অংশকে যা ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি; মুদ্রাস্ফীতির হ্রাসে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, যথা আগাম বাণিজ্যের তালিকা থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলোকে বাদ দেওয়া সম্পর্কেও বাজেট নীরব থেকেছে। এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এম এন আর ই জি এ-র ওপর চলতি বরাদ্দ বজায় থাকবে। মুদ্রাস্ফীতির হার তীব্র হওয়া সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে এম এন আর ই জি এ-র বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি, মোদী সরকারও সেই ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখল।

সামাজিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যয়কে ব্যাপকভাবে ছেঁটে ফেলার প্রস্তাব করা হয়েছে, তাকে সমগ্র বাজেটের ২০১৩-১৪-র ১০.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২০১৪-১৫-তে ৪.৪২ শতাংশ করা এবং পরিকল্পনা খাতে সমগ্র ব্যয়ের ২০১৩-১৪-র ২৬.৭ শতাংশ থেকে ২০১৪-১৫-তে ১৬.৭ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে।

রেল, রাস্তা ও বন্দর পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যয়ের বরাদ্দ হয়েছে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের (পিপিপি) কাঠামোর মধ্যে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পিপিপি এমন একটা ব্যবস্থা যাতে ব্যাপক দুর্নীতি জড়িয়ে থাকে এবং যার থেকে সরকারি অর্থে বেসরকারি ক্ষেত্র লাভবান হয়। এবারের ব্যাপক ব্যয়বরাদ্দ রিয়েল এস্টেট-এর সঙ্গে যুক্ত হাঙ্গরদের কাছে এক মওকা হয়েই দেখা দেবে যারা পিপিপি মডেলকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক লাভ ঘরে তুলবে।

স্কুল শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম এবং তা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, দেশের যুবকদের জন্য মোদী সরকারের কোন ভাবনা নেই। বাজেটে পাঁচটি নতুন আই আই টি-র জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা—এর সঙ্গে তুলনা করুন সর্দার প্যাটেলের একটি মূর্তি নির্মাণের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের, যা ছিল মোদীর গুজরাট সরকারের একটি প্রিয় প্রকল্প এবং যেটিকে এখন কেন্দ্র গ্রহণ করল। বাজেট থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের লুঠেরা কব্জায় ঠেলে দেওয়া হবে এবং তার ফলে শিক্ষা ব্যাপক সংখ্যাধিক ছাত্রদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বাজেট বিরাট সংখ্যক পার্শ্ব শিক্ষক, আশা, অঙ্গনওয়াড়ি এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রের অন্যান্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মীদের সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছে। মোদী সরকার অসুরক্ষিত, অস্থায়ী চরিত্রের কর্মসংস্থানের মডেলকেই অব্যাহতভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যে মডেল যুবক ও নারীদের শোষণ করে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

একইভাবে, পাঁচটি রাজ্যে এ আই আই এম এস ধরণের পাঁচটি নতুন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। একটি মাত্র মূর্তি নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হওয়া ২০০ কোটি টাকার সঙ্গে আরও একবার এর তুলনা করলে বিষয়টির সঠিক পরিপ্রেক্ষিত ধরা পড়বে।

বাজেটে গৃহীত কিছু সিদ্ধান্ত থেকে নির্দিষ্ট কিছু কর্পোরেশন আশু সুবিধা লাভ করবে। ই-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ চালু করা হয়েছে; এর আগে শিল্প নীতি ও তার উন্নতিবিধান সম্পর্কিত দপ্তর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিল যাতে বলা হয়েছিল যে, ই-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ হলে তা বহু ব্র্যাণ্ডের খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যাবে এবং ঐ শ্বেতপত্র থাকা সত্ত্বেও এটা করা হল। বিজেপি প্রকাশ্যে এই ভাব দেখায় যে তারা বহু ব্র্যাণ্ডের খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের বিরুদ্ধে, কিন্তু ই-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা পিছনের দরজা দিয়ে বহু ব্র্যাণ্ডের খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকেই ডেকে আনছে। মোদী বাহিনীর সঙ্গে ই-বাণিজ্যের রাঘববোয়াল ই-বে নামক কোম্পানির কর্তা পিয়েরে ওমিদায়ারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে সবাই জানে, আর বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত সিনহা এর আগে ভারতে ওমিদায়ার নেটওয়ার্ক-এর প্রধান রূপে কাজ করেছেন।

সুপ্রীম কোর্ট ২০১২ সালে ভোডাফোন-এর অনুকূলে রায় দেওয়ার পর পূর্ববর্তী সময় থেকেই কার্যকর করা কর ধার্যের যে আইন তৈরি করা হয়েছিল অর্থমন্ত্রী তাকে কার্যত স্থগিত করে দিয়েছেন। ঐ আইন বলে মূলত ভারতে থাকা সম্পদের বিদেশ থেকে লেনদেনের ওপর পূর্ববর্তী সময় থেকে কার্যকর করা কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার অর্থমন্ত্রী একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছেন, ঐ আইন প্রয়োগের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে যাদের সম্মতি নিতে হবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি অল্প কিছুদিন আগে ভোডাফোন-এর ২০,০০০ কোটি টাকা কর সংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিষয়টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অর্পণ করেছেন অর্থ দপ্তরেরই রাষ্ট্রমন্ত্রী নির্মলা সিতারামন-এর উপর। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এর আগে আইনজ্ঞ হিসেবে ঐ কর্পোরেশনের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে স্বার্থের যে সংঘাত দেখা দিতে পারে তার জন্যই তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এখন, বর্তমান অর্থমন্ত্রী যদি ডোভাফোন মামলা ও ঐ ধরণের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগ থাকা পূর্ববর্তী সময় থেকে কার্যকর করা কর ধার্য সংক্রান্ত আইনকে লঘু করে তোলেন তাহলেও কি স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয় না?

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোম্পানিগুলোর জন্য ১০ বছর কর ছাড়ের যে ব্যবস্থা ছিল বাজেটে তাকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন যে, খনন কার্যের পথে 'বাধাগুলোকে' দূর করা হবে এবং ফলে খনন ক্ষেত্র চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বাধাগুলো হল আদিবাসীরা যাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব এবং জমি জঙ্গলের ওপর অধিকারের জন্য লড়াই করছেন। খনন ক্ষেত্রের জাতীয়করণই সময়ের দাবি ছিল, যাতে করে কর্পোরেশন ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দ্বারা আমাদের বহুমূল্য সম্পদের প্রকাশ্য লুণ্ঠনের অবসান ঘটানো যায়, যে লুণ্ঠন আবার ব্যাপক দুর্নীতির জন্ম দেয়। এর পরিবর্তে বাজেট বক্তৃতা জানাচ্ছে যে, লুণ্ঠনের পথে বাধাগুলোকেই আরও অপসারিত করা হবে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা এই ইঙ্গিতও দিচ্ছে যে, নগদে অর্থ হস্তান্তরিত করার জমানা শুরু হবে এবং এম এন আর ই জি এ-কে ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করে তুলে তার অবলুপ্তির পথ প্রশস্ত করা হবে।

এক কথায় বললে, দিশার দিক থেকে মোদী সরকারের প্রথম বাজেট খোলাখুলিভাবেই কর্পোরেটপন্থী ও দরিদ্র-বিরোধী এবং মোদীর নির্বাচনী প্রচারে মূল্যবৃদ্ধির হ্রাস ঘটানো এবং কষ্ট লাঘবের যে প্রতিশ্রুতি জনগণকে দেওয়া হয়েছিল তা পূরণের লক্ষ্যে বাজেটে কিছুই নেই।

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ মুখে 'সুদিন'-এর বুলি—ভেতরে দুর্দিনের ঝুলি

খরা পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ দেশজুড়ে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্যের পরিস্থিতির মাঝে ১০ জুলাই সংসদে পেশ হল মোদি সরকারের প্রথম বাজেট। পেশ করলেন নতুন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির মুখে লাগাম পরাতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নজরে পড়েনি বাজেটে। বরং বাজেটে ঘোষিত বেশ কিছু পদক্ষেপ মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন জোগাবে এমন আশঙ্কা রয়েছে। যেমনটা আশা বা আশঙ্কা করা গেছিল ঠিক তেমনটাই বাজেট সরকারের 'কোর কনস্টিট্যুয়েন্সি' বা মূল পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠীর সেবায় গুরুত্বপূর্ণ একগুচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জেটলি বারবার তাঁদের ''নয়া-মধ্যবিত্তশ্রেণী'' বলে উল্লেখ করলেও, বুঝতে অসুবিধা হয় না আসলে তিনি কাদের কথা বলছেন। বাজেটের টুকরো টুকরো ঘোষণাগুলো জোড়া দিলেই এক নির্ভেজাল বেসরকারি ক্ষেত্র ও কর্পোরেট-ভিত্তিক বৃদ্ধির গল্পটা জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠবে। নির্বাচনের আগে থেকেই মোদি 'ন্যূনতম সরকার, সর্বাধিক প্রশাসন'-এর কথা শুনিয়ে আসছিলেন। তারই প্রতিফলন বাজেট বিবৃতির পাতায় পাতায়। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে, জেটলির বাজেট এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পেশ করা তাঁর পূর্বসূরী চিদম্বরম বা ইউ পি এ সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটেরই প্রতিচ্ছবি। বিশেষ করে, চিদম্বরম অন্তর্বর্তী বাজেটে যে চরম আর্থিক অনুশাসন ও পরিসংখ্যানগত গোঁজামিলের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন জেটলি তাই হুবহু অনুমোদন করেছেন। বাজেটের মূল দর্শনের ক্ষেত্রেও দুই সরকারের বাজেটের মধ্যে কোন ফারাক অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই বাজেট আক্ষরিক অর্থেই উদার সংস্কারমুখী আর্থিক নীতিরই এক ক্লান্তিকর ধারাবাহিকতা।

বিদেশি পুঁজির জন্য ভোজসভা, দেশি পুঁজির জন্য পিকনিক

দেশি ও বিদেশি বেসরকারি পুঁজির প্রত্যাশা মত এই বাজেটে বিরাট বিরাট ঘোষণা না থাকলেও, ভবিষ্যতে সে প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘোষিত হয়েছে ২০১৪-র বাজেটে। প্রথমেই রয়েছে প্রতিরক্ষা ও বিমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা এবং রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে বিনিয়োগের শর্ত শিথিল করা। এতদিন বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারের বিনিয়োগ থেকে যে লাভ করত তা ব্যবসাজাত আয় হিসাবে গণ্য হত। তাতে তাদের বেশি কর দিতে হত। বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী দেশি বিনিয়োগকারীদের মত তাদের ক্ষেত্রেও এই আয় মূলধনী আয় বা ক্যাপিটাল গেইনস্ ট্যাক্স হিসাবে গণ্য হবে। ইউ পি এ সরকারের আমলে পেশ করা প্রত্যক্ষ কর বিধিতে ''জেনারাল অ্যান্টি অ্যাভয়ডেন্স রুলস্'' বলে একটা পরিচ্ছেদ ছিল যাতে কর ফাঁকি ধরা পড়লে অতীত থেকেই লুকোনো আয়ের ওপর কর ও জরিমানা চাপানোর সংস্থান ছিল। এটা নিয়ে শিল্পমহল বিপুল শোরাগোল তোলে এবং ইউ পি এ সরকার এই বিধি দু বছরের জন্য মুলতুবি করে দেয়। সেই অনুসারে ২০১৫-র ১ এপ্রিল থেকে এই রুলস্ লাগু হওয়ার কথা। কিন্তু জেটলি বাজেটে শিল্পমহলকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে মোদি সরকার ঐ ধারা পর্যালোচনা করবে এবং শিল্পমহলের উদ্বেগ নিরসন করবে।

বাজেটে দেশি পুঁজির জন্য রয়েছে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে পি পি পি-র ঢালাও প্রেসক্রিপশন। বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, হাইওয়ে, শহর পুনর্গঠন, শহর পরিবহণ, রিয়েল এস্টেট, গ্যাস পাইপলাইন—কি নেই সেই দেদার ভোজের মেনুতে। বলতে গেলে, 'মোদিনোমিকস্'-এর প্রাক্-নির্বাচন মেনুতে তথা বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে উন্নয়নের মূল রোড ম্যাপটাই ছকা হয়েছিল এই পি পি পি-র রাস্তা ধরে। সেই পথ বাস্তবায়িত করতে বাজেট বক্তৃতায় জেটলি মূল স্রোতের পি পি পি প্রকল্পগুলোর সহায়তার জন্য 'থ্রি-পি ইণ্ডিয়া' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মূলধন হিসাবে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। কে না জানে, পি পি পি হল বেসরকারিকরণের প্রথম ধাপ। জেটলি জানেন, পরিকাঠামোয় পুরো বেসরকারিকরণ এক ধাপে সম্ভব নয়। তাই সরকারি খরচে বেসরকারি ভোজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পি পি পি-র মাধ্যমে। এর সাথে রয়েছে, নতুন করছাড় ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো করছাড়ের সম্প্রসারণ, যেমন—বিদ্যুৎ, সড়ক, রিয়েল এস্টেট-এ ও নয়া উদ্ভূত 'স্মার্ট সিটি' নামক পদার্থটিতে। দেশি কোম্পানিগুলো এখন থেকে আরও সহজে বিদেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সংস্থাগুলোর বিলগ্নিকরণ করে ৬৩,৪২৫ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে বাজেটে (চিদাম্বরমের অন্তর্বর্তী বাজেটে অঙ্কটা ছিল ৫৬,৯২৫ কোটি)। এর ফায়দাটা অবশ্যই লুটবে দেশি বেসরকারি ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটি খুব শীগ্‌গীরই বেসরকারি ক্ষেত্রে পরিণত হবে। আয়কর আইনের অধীনে 'অ্যাডভান্স রুলিং' ও রপ্তানিকারকদের সঙ্গে সম্পর্কিত 'আর্মস্ লেংথ প্রাইস্' সংক্রান্ত ধারাগুলিকে শিথিল করে দেশি পুঁজির পথ মসৃণ করা হয়েছে। বাজেটের সাথে পেশ করা 'রেভিনিউ ফোরগন স্টেটমেণ্ট' জানাচ্ছে, ২০১৩-১৪ সালে কর্পোরেট ক্ষেত্রকে মোট করছাড় দেওয়া হয়েছিল ৭৬,১১৬.৩ কোটি টাকা এবং প্রতি বছরই এটা বাড়ছে। অনুমান করা যায়, চলতি বছরেও সেটা বাড়বে। এ ছাড়াও ব্যক্তিগত আয়করে যে ৪০,৪১৪ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তার সিংহভাগও পকেটস্থ হয়েছে উচ্চবিত্তদের দ্বারা—মোদির ভাষায় যারা ''নয়া-মধ্যবিত্তশ্রেণী''।

চলতি বছরের বাজেটেও প্রত্যক্ষ করে যে ২২,২০০ কোটি টাকার বাড়তি ছাড় দেওয়া হয়েছে তার বড় অংশটাই যাবে এই নয়া-মধ্যবিত্ত করদাতাদের পকেটে। ব্যক্তিগত আয়করদাতাদের ন্যূনতম ছাড়ের সীমা এবার ২ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২.৫ লাখ টাকা, সঞ্চয়ের ওপর সর্বোচ্চ ছাড়ের সীমা ১ লাখ থেকে ১.৫ লাখ এবং গৃহঋণের সুদের সর্বোচ্চ ছাড়ের সীমা ১.৫ লাখ থেকে ২ লাখ করা

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘সুদিন’-এর বুলি ... দুর্দিনের ঝুলি

পাঁচের পাতার পর

হয়েছে। এতে নিম্নতম আয়ভুক্ত করদাতারা ছাড় পাবেন মোট ১০,৩০০ টাকা, আর ১০ লাখ টাকার ওপর আয় সম্পন্ন করদাতারা পাবেন ২০,৬০০ টাকা। গৃহঋণের সুদের ওপর ছাড় বাড়ার ফলে লাভবান হবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, যার পুরোটাই রয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে।

আবারও দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব?

বাজেট বক্তৃতায় জেটলি বলেছেন, কৃষিতে ৪ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করতে তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যে বাজেটে সরকার একটা প্রযুক্তিচালিত দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ঘোষণা করেছে। এতে উৎপাদনশীলতার ওপর জোর দেওয়া হবে এবং ‘প্রোটিন বিপ্লব’ হবে অন্যতম প্রধান জোরের জায়গা। অথচ আর্থিক সমীক্ষায় সরকার স্বীকার করেছে যে চলতি বছরে দেশে বর্ষা কম হওয়ায় এক যথার্থ খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সত্যিই কি বিচিত্র এই দেশ! যে দেশে ৫৫ শতাংশ চাষের জমি এখনও সেচের জন্য বর্ষার জলের ওপর নির্ভর করে, সে দেশের নীতি নির্ধারকরা কি করে ‘প্রযুক্তিচালিত দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব’ বা ‘প্রোটিন বিপ্লব’ ইত্যাদি নিয়ে বাগাড়ম্বর করেন বোঝা যায় না। এইসব বিপ্লব-টিপ্পবের কথা উঠছে, অথচ কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ খাতে কেন্দ্রীয় যোজনা বরাদ্দ কমানো হয়েছে। সমীক্ষাতে স্বীকার করা হয়েছে, মোট জাতীয় আয়ে কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যকলাপের ভাগ ২০১৩-১৪ সালে মাত্র ১৩.৯ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ সারা দেশের কর্মসংস্থানের ৫৪.৬ শতাংশই আসে এই ক্ষেত্র থেকে। ২০০১-এর জনগণনা থেকে ২০১১-র জনগণনার মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা ১২.৭৩ কোটি থেকে কমে ১১.৮৭ কোটিতে এসে ঠেকেছে। আগের বছরের তুলনায় ২০১৩-১৪ সালে হেক্টর প্রতি চালের উৎপাদন কমেছে ১.৫৫ শতাংশ, গমের কমেছে ১.৭৫ শতাংশ, বজরা ৩.০৯ শতাংশ, ডাল ২.৪১ শতাংশ, তেলবীজ ১.৬৩ শতাংশ এবং ছোলা ৫.৯৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রধানত খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনই মার খাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন কৃষকরা খাদ্যপণ্যের চাষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এই চাষ থেকে সরে আসছেন, অন্যদিকে জোগানের ঘাটতি তৈরি হয়ে বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। ফলে মওকা বুঝে হিমঘর মালিক, খাদ্যপণ্যের একচেটিয়া কারবারী এবং ফোড়েরা ফায়দা লুটছে এবং তার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ চাষি ও ক্রেতাদের। হালে আলু ও পেঁয়াজের দামে উল্কাগতির পিছনে এটাই কারণ।

এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের কোন দিশা বাজেটে নেই। দিশাহীন অর্থমন্ত্রীর ঘোষণাগুলো সমস্যার ধারেকাছেও পৌঁছতে সাহায্য করবে না। ঘোষণাগুলো হল—৫০০ কোটি টাকার মূলধন সম্পন্ন ‘প্রাইস স্টেবিলাইজেশন ফাণ্ড’ সৃষ্টি করা যাতে চাষিরা দামের ওঠাপড়ার হাত থেকে রক্ষা পায়, ঠিক সময়ে ঋণ শোধ করলে স্বল্পমেয়াদি শস্যঋণে ৩ শতাংশ সুদ হ্রাস, ৫ লাখ ‘ভূমিহীন কিষাণ’ যৌথ-চাষ গোষ্ঠীকে অর্থ সাহায্য করা, চাষিদের জমির উর্বরতা সংক্রান্ত কার্ড দেওয়া, চলমান জমি পরীক্ষা গবেষণাগার, কিষাণ টিভি, জাতীয় অভিন্ন কৃষি বাজার, রাজ্যগুলির সাথে আলোচনা করে কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত আইন সংশোধন ও তাকে আরও উদার করা, আরও কৃষি ও ফলফুল চাষের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, কৃষি-প্রযুক্তি পরিকাঠামো তহবিল গঠন ইত্যাদি। এ সব দিয়ে কি কৃষকদের আত্মহত্যা ঠেকানো বা তাদের জীবনজীবিকার সমস্যা সমাধান আদৌ করা যাবে?

বাজার বনাম বাজেট

বাজার আকাশছোঁয়া। বাজেট নিরুত্তর। বাজারের আগুন প্রধানত গ্রাস করেছে খাদ্যদ্রব্যকে। মূল কারণ কৃষি সংকট। শুধু খাদ্যদ্রব্যই নয়, প্রায় সমস্ত নিত্যব্যবহার্য পণ্যই মূল্যবৃদ্ধির জ্বরে আক্রান্ত। খুচরো মূল্যের সূচক বৃদ্ধির হার বর্তমানে ৭ শতাংশেরও বেশি এবং জীবনধারনের খরচের সূচক বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশের আশেপাশে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের সূচকের গড় বৃদ্ধির হারও গত দু বছরে ১২.২ শতাংশ থেকেছে। পাশাপাশি মন্দা চলছে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদনে। গত দু বছরে এই ক্ষেত্রে গড় বৃদ্ধির হার থেকেছে মাত্র ০.২ শতাংশ। আর্থিক বৃদ্ধির হারও ২০০৪-০৫-এর ৮.৩ শতাংশ থেকে ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪-তে নেমে এসেছে ৪.৬ শতাংশে। মুদ্রাস্ফীতির সাথে সাথে মন্দা মিলে তৈরি হয়েছে এক যথার্থ স্থিতিস্ফীতির পরিস্থিতি। মন্দার কারণ চাহিদায় ঘাটতি, আর চাহিদায় ঘাটতির কারণ দেশের মানুষ বা সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া।

এ থেকে উদ্ধারের কোন রাস্তাও বাজেট দেখাতে পারেনি। উল্টে প্রতি বছর বিপুল বাজেট ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে রাজকোষ ঘাটতির সংশোধিত অঙ্ক ধরা হয়েছে ৫,২৪,৫৩৯ কোটি টাকা বা জি ডি পি-র ৪.৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫-র বাজেটে সেটা টাকার হিসাবে বেড়ে হচ্ছে ৫,৩১,১৭৭ কোটি টাকা, জি ডি পি-র অনুপাতে যা দাঁড়াবে ৪.১ শতাংশ। অন্তর্বর্তী বাজেটেও অঙ্কটা হুবহু একই ছিল। অথচ ২০১২-১৩-র বাজেটে এই ঘাটতি ছিল জি ডি পি-র ৪.৮ শতাংশ। তাহলে কোন মন্ত্রবলে সেটা এবার ৪.১ শতাংশ হবে? এখানে জেটলি পরিসংখ্যানগত কৌশল করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন, বাজেটে ঘোষিত নীতিগুলির ফলে পরিকাঠামো ও রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে এবং তার ফলে উৎপাদন ও জাতীয় আয় বেড়ে রাজস্ব বাড়বে। এর পাশাপাশি, রাষ্ট্রায়ত্ত পরিকাঠামো কোম্পানি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর শেয়ার বেচে ভাল পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে। এই দুই বাড়তি আয়ের ওপর ভর করে তিনি ঘাটতিকে ৪.১ শতাংশে বেঁধে রাখতে পারবেন। কিন্তু তিনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে ২০১৩-১৪ সালে বিলগ্নিকরণ বাবদ আয় হয়েছিল মাত্র ২৫,৮৪১ কোটি টাকা। সেটাও সম্ভব হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক সংস্থাগুলোর বদান্যতায়, কারণ শেয়ার বেচে খোলা বাজার থেকে থেকে কাঙ্খিত পরিমাণ অর্থ আদায় হয়নি। তাহলে কোন ভরসায় তিনি এবার বিলগ্নিকরণ খাতে ৬৩,৪২৫ কোটি টাকার অবাস্তব (এবং অবাঞ্ছিত) লক্ষ্যমাত্রা রাখলেন? লোককে বোকা বানানোর জন্য?

সুতরাং বাজেট ঘাটতির বোঝা মেটাতে ঋণ নেওয়া চলছে, চলবে। আর মন্দার বাজারে সেই অর্থ মুদ্রাস্ফীতির আগুনে ঘি ঢেলে তেতে থাকা পণ্যের বাজারকে আরও তপ্ত করে তুলবে।

‘সকলের জন্য—সকলের সাথে’ ধোঁকা

মোদি শ্লোগান দিয়েছেন ‘সকলের জন্য—সকলের সাথে’ উন্নয়ন। কোন ‘সকল’? অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির ভাষায় যে ৭৭ শতাংশ ‘সকল’ ২০০৪-০৫ সালে দৈনিক ২০ টাকার কম আয়ে দিন গুজরান করত? যোজনা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত রঙ্গরাজন কমিটির হালফিল রিপোর্ট অবশ্য দারিদ্রের সংজ্ঞাটাকে শহরে দৈনিক ৪৭ টাকা ও গ্রামে ৩২ টাকা আয়ের নীচে বেঁধে দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই সমালোচনার মুখে পড়েছে। এমনকি তাদের রিপোর্ট মতও প্রতি দশ জন ভারতবাসীর মধ্যে তিন জন দরিদ্র। এইসব ‘সকল’-দের জন্য বাজেটে কি আছে? তাদের জন্য কর্মসংস্থানের কোন রূপরেখা নেই। বছরে ১০০ দিনের কাজের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বরাদ্দ গত বছরের ৩৪,০০০ কোটিতেই বেঁধে রাখা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ তার প্রকৃত মূল্যে যে হ্রাস ঘটে, তারও খেয়াল রাখা হয়নি। অর্থাৎ প্রকৃত মূল্যে বরাদ্দ কমেছে। বিজেপি-শাসিত বসুন্ধরা রাজে সরকার রাজস্থানে এই প্রকল্পটা তুলে দেওয়ারই তোড়জোড় করছে। কে জানে, হয়ত মোদি সরকারও অচিরে বসুন্ধরা রাজে সরকারেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। ইন্দিরা আবাস যোজনার ক্ষেত্রেও তথৈবচ। সারে ভর্তুকিও গত বাজেটের ৬৭,৯৭১ কোটিতেই বেঁধে রাখা হয়েছে। ওদিকে পেট্রোলিয়ামের ওপর ভর্তুকি এক ধাক্কায় ২২,০৩৪ কোটি টাকা (২৫.৭৭ শতাংশ) কমানো হয়েছে। এ হল দ্রুতই ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের ওপর ভর্তুকি তুলে দেওয়ার পূর্বসংকেত।

মুখে উন্নয়নের কথাবার্তা, অথচ কেন্দ্রীয় যোজনায় বাজেটের সহায়তা গত বছরের থেকে ১,৩৯,৭৩৩ কোটি টাকা (৩৯.১৯ শতাংশ) কমানো হয়েছে। যোজনা বরাদ্দ কমেছে গ্রামোন্নয়ন, সামাজিক পরিষেবা এবং মহিলা ও শিশু বিকাশ খাতে। সবচাইতে মারাত্মক হল, মোট যোজনা খরচে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ভাগ যোজনা কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে তাদের জনসংখ্যার অনুপাত মত যথাক্রমে ৪৭,০০০ কোটি এবং ১৪,০০০ কোটি টাকা কম রাখা হয়েছে। অনগ্রসর জাতিগুলির ব্যাপারে মোদির চোখের জলের এই হল নমুনা! এইসব প্রতারণা ঢাকার জন্য জেটলি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় নয় নয় করে ২৮টি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, ‘লে লে বাবু ছে আনা’-র মত যার প্রত্যেকটিতে ১০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে, ২০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বরাদ্দের আরও বেশ কিছু প্রকল্প। কিছুদিন বাদেই গতানুগতিক এইসব প্রকল্প মানুষের স্মৃতি থেকে ক্রমে মুছে যাবে।

মোদি সরকারের হাতে টাকা নেই। তবু অন্তর্বর্তী বাজেটের তুলনায় চূড়ান্ত বাজেটে জেটলি প্রতিরক্ষা খাতে ৫,০০০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করেছেন। মোট বরাদ্দ ২,২৯,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫১.৯১ শতাংশই বা ১,১৮,৮৬৭.২৩ কোটি যাবে স্থলবাহিনীর হাতে, যার মধ্যে থেকে আবার ২৫,১৯৭.৯১ কোটি খরচ হবে মূলধনী খাতে, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র কিনতে। প্রতিরক্ষার মোট খরচের ৬.৬৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডি আর ডি ও-র জন্য। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা আঁটোসাটো করতে আই বি, বি এস এফ, এস পি জি এবং সি আর পি এফ-এর বরাদ্দ ও দেশের নানা সীমান্ত মজবুত করতে বরাদ্দ অনেকখানি বাড়ানো হয়েছে। মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রতিবেশি দেশগুলোর প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানোর আপাত সৌহার্দ্যমূলক কূটনীতি কি তাহলে শুধুই এক দেখনদারি?

বাজেটের ওপর সংঘ পরিবারের ছাপ ফেলতেও ভুল করেননি জেটলি। নিজের দলের মৌলিক হিন্দুত্ব সমর্থন ভিত্তিকে আশ্বস্ত করতে সংঘ পরিবারের মতাদর্শগত নেতৃবৃন্দ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায় ও মদনমোহন মালব্যর নামে নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। তার সাথে সাথে কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গুজরাটে কংগ্রেসের সবচাইতে কট্টর হিন্দু মুখ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পূর্ণাবয়ব মূর্তি গড়ারও সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, যে মূর্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাচু অফ লিবার্টির চাইতেও উঁচু হবে। এইভাবে প্রথম বাজেট দিয়েই হিন্দু জাত্যাভিমানে উস্কানি দেওয়ার কাজটা কৌশলে শুরু করল মোদি সরকার। সবমিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে, দেশে কোন সে ‘সুদিন’ সমাসন্ন!

- সুকান্ত মণ্ডল

কর্মসংস্থানের ওপর বিজেপি সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঁকুড়ায় প্রচার সভা

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের বাজেট তথা আর্থিক নীতির অভিমুখটাই হল চরম গরিব বিরোধী। তাই ব্যাপকতম প্রচার অভিযান গড়ে তুলে বিজেপির মুখোশ খুলে দেওয়ার কাজে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গত ১১ জুলাই বাঁকুড়া শহরের মাচানতলা মোড়ে আয়োজিত এক প্রচারসভায় পার্টির নেতৃবৃন্দ এই আহ্বান জানান। যেমন ১০০ দিনের কাজ সম্পর্কে বাজেটে বলা হয়েছে যে, এটা গ্রামীণ এলাকায় ‘মজুরি দেওয়া’ এবং ‘স্বনির্ভর’ করে তোলার সুযোগ করে দেবে। অথচ ১০০ দিনের কাজের আইনি ভিত্তি হল ঃ ‘‘মজুরি ও কাজ দেওয়া সরকারের দায়—কাজ পাওয়া গরিবের অধিকার’’ অর্থাৎ ১০০ দিনের আইনে গরিব মানুষের কাজের অধিকারের একটা ন্যূনতম স্বীকৃতি আছে অন্তত কাগজে কলমে তো ছিলই! কিন্তু বিজেপি সরকার স্বনির্ভরতার বুলির আড়ালে কাজের আইনি অধিকারকে খর্ব করা এবং ‘আইন’ থেকে ‘প্রকল্প’ হিসাবে একে রূপান্তরিত করার চক্রান্ত করছে। বাজেট ভাষণে ১০০ দিনের কাজকে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা কৃষিমজুর সংগঠনের দীর্ঘদিনের দাবি। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ আদৌ বাড়ানো হয়নি। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজ্যের মজুরি অনুযায়ি ১০০ দিনের কাজের মজুরি স্বল্প পরিমাণে হলেও বেড়েছে। এর নিট ফল ঃ ধাপে ধাপে কাজের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া। বাজেটে বলা হয়েছে—১০০ দিনের কাজকে আরও ‘উৎপাদনশীল’ ও ‘স্থায়ী সম্পদ’ সৃষ্টির লক্ষ্যে চালানো হবে। এভাবে একটা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, এটা যেন একটা দান-খয়রাতির প্রকল্প। গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, জলাশয় সংস্কার সহ জলসম্পদ উন্নয়ন, জমির সমতলিকরণের মাধ্যমে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি—এ সবের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ১০০ দিনের কাজের অন্যতম সুফল হিসাবে থেকেছে। ‘খয়রাতি’ যেটুকু করা হয় তা দুর্নীতির উল্টো পিঠ হিসাবে ঘটে থাকে। গরিবদের ছিটেফোঁটা ‘সাহায্য’ ছুঁড়ে দিয়ে গ্রামীণ শাসক-মাতব্বররা মোটা অর্থ চুরি করে। যা বন্ধ করা জরুরী।

অপরদিকে এই রাজ্যে তৃণমূলের শাসনে কাজ করে মজুরি দীর্ঘদিন না পাওয়ার কারণে ১০০ দিনের কাজ সম্পর্কে একটা অনীহার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। একটি পরিবারের প্রত্যেকের নামে নামে জব কার্ড, ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খোলা প্রভৃতি জটিলতার কারণে অনেকেই কাজে লাগাতে পারছে না। এর ফলে দুর্নীতি ব্যাপকমাত্রায় বেড়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে ১০০ দিনের কাজকে একটা অচলাবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে মোদী এবং মমতা সরকার উভয়েই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রশ্নে চরম নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছে। আসলে সুকৌশলে কর্মহীনতা সৃষ্টি করে সস্তা শ্রমের বাজারকে সম্প্রসারিত করে গ্রামীণ ধনী শ্রেণী এবং কর্পোরেট লবিকে তুষ্ট করার চেষ্টা চলছে। প্রচারসভা থেকে বলা হয়, গরিব মানুষের খাদ্য সরবরাহ করার দায় থেকে সরকার ক্রমশই হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। বাজেটে ভর্তুকি ধাপে ধাপে তুলে দেওয়ার কথা বলে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পগুলোকে গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এ রাজ্যে কিছু ‘চমক’ সৃষ্টি

সাতের পাতায় দেখুন

সি পি এন (ইউ এম এল)-এর নবম কংগ্রেস উপলক্ষে সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দন বার্তা

(সি পি আই (এম এল)-এর এক প্রতিনিধিদল সি পি এন (ইউ এম এল)-এর নবম কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজারাম সিং ও বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য বীরেন্দ্র গুপ্ত। এই কংগ্রেস উপলক্ষে সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য যে অভিনন্দন বার্তা পাঠান তা নিচে দেওয়া হল।)

প্রিয় কমরেডগণ,

সি পি এন (ইউ এম এল)-এর নবম কংগ্রেস উপলক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এবং ভারতের প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রপ্রেমী জনগণের পক্ষ থেকে আমরা সমবেত সমস্ত কমরেডদের প্রতি উষ্ণ বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই। উপস্থিত সমস্ত বিদেশী অতিথিদেরও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও প্রগতিবাদী আন্দোলনের প্রতি, বিশেষভাবে দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত কমরেডদের প্রতি আমাদের সংহতি জ্ঞাপন করছি।

নেপালের কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীরা যে বিজয় অর্জন করেছেন, যার ফলে রাজতন্ত্রের যুগান্তকারী অবসান ঘটেছে এবং সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে, ভারতের কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঙ্গে তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। নেপালের প্রথম সংবিধান সভা সংবিধান রচনার কর্তব্য সম্পন্ন করতে না পারার জন্য নেপালের জনগণের যে আশাভঙ্গ হয়েছে আমরা তারও অংশীদার; আমরা অবশ্য এই আশাও পোষণ করি যে বর্তমান সংবিধান সভা ঐ কাজ সম্পন্ন করতে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনগণের অধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম এমন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য নেপালি জনগণের আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির বেপরোয়া ফাটকাবাজি, সীমাহীন মুনাফা এবং পৃথিবীর সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্পোরেশনগুলোর সর্বগ্রাসী লালসা, অধিকাংশ দেশের শাসক শ্রেণীগুলোর বিশ্ব পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে যোগসাজশ এবং তার সাথে জনগণের বুনিয়াদি প্রয়োজনগুলো পূরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলোর তাদের দায়িত্বকে পরিত্যাগ—এই সমস্ত প্রবণতা বিশ্বজুড়ে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টিতে অবদান জুগিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে কম উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে গভীরতর দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, কেননা এই সংকটের সবচেয়ে ভারি বোঝাটা বহন করা এবং জনগণের যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তোলা এবং পরিবেশের ক্রমবর্ধমান অবনতি ঘটানোর দিক থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চরম মূল্য দেওয়াটাকেই তাদের নিয়তি করে তোলা হয়েছে।

স্থানীয় ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্বগুলোকে বাড়িয়ে তুলে সেগুলো থেকে ফায়দা তোলার যে নীতি বিশ্বের আধিপত্যকারী শক্তিগুলোর রয়েছে তা বিশ্ব পরিমণ্ডলকে আরও বিষিয়ে তুলছে, ফলে বিশ্বের এক বড় অংশে যুদ্ধ এবং বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রায় স্থায়ীভাবেই বিরাজ করছে। সংঘাত, সন্ত্রাস ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক হিংসার বিভিন্ন ধারা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সারা বিশ্বে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং প্রগতিবাদী সামাজিক রূপান্তরণের শক্তিগুলোকে এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের সামনে এই সমস্ত জটিলতা ও চ্যালেঞ্জ যথেষ্ট মাত্রাতেই রয়েছে।

পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার যে সম্পর্ক সি পি এন (ইউ এম এল)-এর সঙ্গে আমাদের রয়েছে, সি পি আই (এম এল) তাকে লালন করে ও অত্যন্ত মর্যাদা দেয় এবং নেপালি কমরেডদের চালানো সংগ্রাম ও বিজয় অর্জন থেকে আমরা যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাই। আমরা আপনাদের নবম কংগ্রেসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং আগামী দিন ও বছরগুলোতে আরও বহু বিজয়ের প্রত্যাশা করি। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নির্মাণ এবং প্রগতিশীল সামাজিক রূপান্তরণের যে আকাঙ্খা নেপালি জনগণ পোষণ করেন তা পূরণের লক্ষ্যে সি পি আই (এম এল) আগের মতই তাঁদের পাশে দাঁড়াবে।

সি পি আই (এম এল)-সি পি এন (ইউ এম এল) মৈত্রী ও সহযোগিতা দীর্ঘজীবী হোক!

ভারত-নেপাল মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক!

নেপালি জনগণ বিজয় ও শক্তি অর্জন করুন!

— বিপ্লবী অভিনন্দন সহ

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

(মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) লিবারেশন

বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির দশম পুনর্গঠন বার্ষিকী উপলক্ষে সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটির শুভেচ্ছাবার্তা

বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির দশম পুনর্গঠন বার্ষিকী উদযাপনের আনন্দমুখর দিনটিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী সহ সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের উষ্ণ বিপ্লবী অভিনন্দন। আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনে এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

আপনারা জানেন সদ্যসমাপ্ত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে উগ্র-দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি গোটা দেশজুড়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেছে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্নীতি, সর্বাত্মক ব্যর্থতা, ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কর্মদক্ষ সরকার পরিচালনা ও সুদিন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপির এই অভাবনীয় উত্থানে ভারতের বামপন্থী ও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মহলের কাছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ও বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলেও এই রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ছাপ পড়া স্বাভাবিক।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের ও ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লবী আন্দোলনের ও আমাদের উভয় পার্টির অগ্রগতি ও আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংগ্রামী ঐতিহ্য রক্ষায় আপনাদের ধারাবাহিক ভূমিকা আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। আগামী দিনগুলোতে আমাদের উভয় পার্টি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক, আমাদের স্বাভাবিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা সম্পর্ক আরও বিকাশলাভ করুক এবং উভয় দেশের জনগণ গণতন্ত্র, উন্নয়ন, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পথে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলুক—এটাই আমাদের ঐকান্তিক ভাবনা।

সংগঠকের ডায়েরি

ময়নাগুড়িতে প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্তর্কলহে বিগত বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী বিজয়ী হলেও মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি মাঝপথে পাল্লাভারী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তৃণমূলের নির্দেশে বিধায়ক পদ ত্যাগ করেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনা তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়, তৃণমূল লোকসভা নির্বাচনে একইসঙ্গে এই কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন ঘোষণা করে এবং রেকর্ড ভোটে আবার অনন্ত দেবকে তাদের প্রার্থীরূপে বিধানসভায় পুনর্নির্বাচিত করে। এই ঘটনার ফলে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় সহজ হয়।

অন্যদিকে যে দীনবন্ধু রায়কে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক অনন্ত দেবের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট গলা ফাটিয়ে প্রচার করল সেই দীনবন্ধু রায় ৬০,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রত্যাশায় দলত্যাগ করে বর্তমানে তৃণমূলের সাথে পাল্লা দেওয়া বিজেপিতে গিয়ে যোগদান করেছেন। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে বামফ্রন্টকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে বিজেপিই সামনে চলে এল। সমগ্র বিধানসভা এলাকায় বামফ্রন্টের সামাজিক ভিত্তি বিজেপিতে চলে গেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন আসন না জিতেও বিজিত পঞ্চায়েত সদস্যরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় পর পর দুটো অঞ্চল বিজেপির দখলে গেছে যদিও একটি অঞ্চল আবার তৃণমূল ফিরে পেয়েছে। ময়নাগুড়ি কলেজে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে তিনজন তৃণমূল ছাত্র নেতা আহত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙ্গচুর হয়েছে। এরপর বিজেপি পাঁচ হাজার লোকের এক মহামিছিল করেছে।

এইরকম পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফল ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এগিয়ে যাওয়ার এক সঠিক কর্মপন্থা আমাদের ঠিক করে নিতে হবে। যাতে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী প্রতিনিধি হিসাবে সি পি আই (এম এল) সামনে থাকতে পারে। আমরা এবারকার বিধানসভা উপনির্বাচনে ভোট পেয়েছি মোট ২০৮২, যা মোট বৈধ ভোটের প্রায় ১.০৮ শতাংশ। বিজেপির সমর্থনে কামতাপুর পিপলস পার্টি মোট বৈধ ভোটের ৫.৭ শতাংশ পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। কিন্তু নির্বাচন-উত্তর পরিস্থিতিতে কামতাপুর পিপলস পার্টিকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে বিজেপি নিজে আর এস পি-র প্রাপ্ত ৩৫ শতাংশ ভোটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এইদিক থেকে ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কামতাপুর পিপলস পার্টির এই কেন্দ্রে বিজেপির সমর্থন পাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই রইল না। বর্তমানে আর এস পি-র যা অবস্থা তাতে আর এস পি যদি বামফ্রন্ট ত্যাগ করে তাহলে ময়নাগুড়ি কেন্দ্রে সি পি এম কী করবে? বিজেপি এবং তৃণমূল সামনে একসাথে চলে আসায় সি পি এম এক চরম রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং বিজেপির ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সমানভাবে আক্রমণাত্মক প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু হবে কেন্দ্রের জনবিরোধী বাজেট এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে তুলে ধরে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী করতে হবে। বামফ্রন্টের পতনের সময়কাল থেকে পর পর দুটি বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবারই বামফ্রন্টের ভোটব্যাঙ্ক থেকে হাজারের মতন ভোট আমাদের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। আজ বামদলগুলো ভেঙ্গে লোক তৃণমূল এবং বিজেপিতে যাচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বামদলগুলোর মধ্যে তৃণমূল এবং বিজেপির দিকে যাওয়ার দরজা যেমন তৈরী হয়েছে তেমনি আমাদের দিকে আসার ছিদ্রও বর্তমান। এই ছিদ্রকে অনুসন্ধান করতে হবে। আজ বাম শক্তি পুনর্বিন্যাসের সময় লেনিনের এই মূল্যবান বক্তব্য আমাদের পাথেয় হোক ''বাঁধের মধ্যে ছিদ্র অনুসন্ধান করে সেই ছিদ্র দিয়ে জল ঢুকিয়ে দিতে পারলে ছিদ্র প্রসারিত হয়ে ভাঙ্গন আমাদের দিকেই চলে আসবে''।

- ভাস্কর দত্ত

... মান্যতা দেয়নি কার স্বার্থে?

চারের পাতার পর

সদস্য। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলোকে ৪টি জোনে বিভক্ত করে জোন জয়েন্ট এ্যাকশন ফোরাম এবং জেলা স্তরে জেলা জয়েন্ট এ্যাকশন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য ও জেলা স্তরে সচেতনতা শিবির সংগঠিত করা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে শ্রমিক মহল্লায় এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে এই প্রচার কর্মসূচী চলবে। এর সাথে সাথে ভারত সরকারের কাছে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে দাবিগুলোকে তুলে ধরা হবে। ভারতবর্ষে যখন কেন্দ্রীয় সরকার দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি-শিল্পপতি-কর্পোরেট হাউসের স্বার্থে একের পর এক আইন পাশ করে চলেছে এবং শ্রম আইনকে পুঁজির স্বার্থে লঘু করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন শ্রমিকদের বুনিয়াদী দাবিগুলোকে জোরের সাথে তুলে ধরার জন্য আগামী দিনে বৃহত্তর যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী।

- দিবাকর ভট্টাচার্য

... বাঁকুড়ায় প্রচার সভা

ছয়ের পাতার পর

করে তৃণমূল সরকার গরিবের মূল মূল দাবিগুলোকে উপেক্ষা করার নীতি নিচ্ছে। বামফ্রন্টের নেতারা তৃণমূলের মৌখিক বিরোধিতা করলেও ৩৪ বছরের 'গুণকীর্তন' করছে বেশী! ফলে মানুষের মধ্যে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকছে না। এসব কারণেই জেলার বিভিন্ন স্থানে বিজেপির শক্তি বাড়ছে। আজ যখন মূল্যবৃদ্ধি, কাজ ও ন্যায্য মজুরির প্রশ্নগুলো আরও জ্বলন্ত হয়ে উঠছে তখন বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রামী জোট গড়ে তোলার সম্ভাবনাও বাড়ছে। পথে নেমেই জনগণের নতুন জোট গড়ে তুলতে হবে। সভা থেকে এই আহ্বান জানানো হয়। এর পরদিন ১৩ জুলাই জেলা কর্মী বৈঠকের পর ওন্দা ব্লকের নিকুঞ্জপুর স্কুল মোড়ে অনুরূপ প্রচারসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জী, জেলা কমিটি সদস্য আদিত্য ধবল, রাজ্য কমিটি সদস্য সজল পাল, জয়তু দেশমুখ।

ইজরায়েল গাজা থেকে হাত ওঠাও!
ভারত সরকারকে ইজরায়েলি হামলার বিরোধিতা করতে হবে!

গাজার ওপর যে বর্বর সামরিক হামলাকে ইজরায়েল তার বার্ষিক পার্বণ করে তুলেছে, সেই রক্ত ঝরানোর উৎসবে সে আরও একবার মেতে উঠেছে এ মাসের ৮ তারিখ থেকে। নির্বাচনের মাধ্যমে হামাস গাজার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও ইজরায়েলের চোখে এই গোষ্ঠী তাদের 'চরম শত্রু'। হামাসকে শিক্ষা দেওয়ার নামে হাজার হাজার বোমা সে ফেলে চলেছে গাজার ওপর। হামাসের রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রগুলো তার আক্রমণের নিশানা বলে ইজরায়েল ঘোষণা করলেও তার অধিকাংশ বোমাই আঘাত করছে অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর। উদ্বাস্তু শিবির, নাগরিকদের ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো—কোন কিছুই বাদ যাচ্ছে না ইজরায়েলি বোমার নিশানা থেকে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৭৫ জনেরও বেশি গাজার নাগরিক নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ মানুষ এবং তাদের মধ্যে আবার ব্যাপক সংখ্যকই শিশু, নারী ও বৃদ্ধ। আহতের সংখ্যাও এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে বলে সংবাদে প্রকাশ। এই হামলার প্রত্যুত্তরে হামাসও ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে রকেট ছুঁড়ছে, তবে সেই রকেট হানায় কয়েকজন ইজরায়েলি নাগরিকের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও কারও নিহত হওয়ার খবর মেলেনি। আক্রমণকে আরও তীব্র করে তোলা হবে বলে ইজরায়েল হুমকি দেওয়ায় বহু প্যালেস্তিনিয় নাগরিক ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অন্যত্র চলে গেছেন। রাষ্ট্রসংঘের কর্মীদের হিসেব অনুযায়ী ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ১৭,০০০-রও বেশি। হাসপাতালগুলোতে আহত মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে, গাজার ওপর ইজরায়েলি অবরোধের ফলে ওষুধ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব চিকিৎসাকে আরও কঠিন এবং পরিস্থিতিকে আরও অসহায় করে তুলেছে। গাজায় কর্মরত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীরা জরুরী ভিত্তিতে অর্থ ও ওষুধপত্র সরবরাহের আবেদন জানিয়েছেন। বিমান আক্রমণের সাথে ইজরায়েল নৌ আক্রমণও জারি রেখেছে এবং ২০১২ সালের নভেম্বর মাসের মত সেনা পাঠিয়ে গাজা দখলের জন্য ইজরায়েল ৪০,০০০ সেনাকে তৈরি রেখেছে বলেও জানা গেছে।

এবারের হামলার উৎস তিন ইজরায়েলি যুবকের হত্যার মধ্যে রয়েছে বলে ইজরায়েল দাবি করছে এবং পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমগুলো সহ বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যমগুলো সে কথা প্রচার করছে। ১২ জুন তিন ইজরায়েলি যুবক ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে অপহৃত হয় ও পরে তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই অপহরণ ও হত্যার জন্য ইজরায়েল হামাসকে দায়ি করলেও হামাস তা অস্বীকার করে। এই অপহরণ ও হত্যার ঘটনা যে সামরিক আক্রমণের এক অছিলা তা ঘটনাবলীর বিকাশ থেকেই বোঝা যায়। প্রথমত, অপহরণের ঘটনার কয়েক মাস আগে থেকে ইজরায়েল ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক জুড়ে ধরপাকড় অভিযান চালাতে থাকে এবং শতাধিক প্যালিস্তিনিয় যুবককে গ্রেপ্তার করে। দ্বিতীয়ত, অপহরণের পরপরই মৃতদেহগুলো পাওয়া গেলেও ইজরায়েলের সরকার সেকথা চেপে রাখে যা পরিস্থিতিকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলতে ইন্ধন যোগায়। আর সর্বোপরি, ঐ ঘটনার পর পূর্ব জেরুজালেম থেকে এক প্যালেস্তিনিয় যুবককে অপহরণ করে পুড়িয়ে মারা হয় যা পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। এই ধরনের হত্যার ঘটনা দুঃখজনক ও অমানবিক হলেও কোন রাষ্ট্রের তরফেই তাকে সামরিক আগ্রাসনের কারণ করে তোলা উচিত নয়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়াকে আটাকানো ও স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টার পরিবর্তে ইজরায়েল তাতে আরও প্ররোচনাই জুগিয়েছে। ইজরায়েল সবসময় নিজেকে 'আক্রান্ত' দেখিয়ে তার সামরিক আগ্রাসনের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে, প্যালেস্তিনিয়দের রকেট হামলা থেকে তার নাগরিকদের রক্ষার লক্ষ্যেই তাকে আক্রমণের পথে যেতে হয় বলে যে বিশ্বের কাছে যুক্তি দেয়। আমেরিকা সহ পশ্চিমের দেশগুলো 'নিজের আত্মরক্ষার অধিকার ইজরায়েলের আছে' এই কথা বলে তার আক্রমণে মদত যোগায়। তিন ইজরায়েলি যুবকের অপহরণ ও হত্যার ঘটনাটিতেও সে নিজেকে 'আক্রান্ত' বলে দেখিয়ে সামরিক হামলাকে ন্যায্য প্রতিক্রিয়া বলে চালাতে ও দুনিয়াকে প্রতারিত করতে চাইছে। প্যালেস্তাইন সমস্যার কোন সমাধানই ইজরায়েলের অভিপ্রেত নয়, সমস্যা সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে বানচাল করতেই সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার আসল লক্ষ্য, প্যালেস্তাইনের ওপর অধিকার থেকে প্যালেস্তিনিয়দের বঞ্চিত করে, সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করে প্যালেস্তাইনের জমিকে গ্রাস করে ইজরায়েলি রাষ্ট্রের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া। এটা তার সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য, আর এই লক্ষ্যেই সে প্যালেস্তাইনের জমিতে ইহুদি বসতিকে বাড়িয়ে চলেছে, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে তার উপনিবেশ করে তুলেছে, গাজার ওপর অবরোধ কায়েম করেছে আর কিছুদিন অন্তরই গাজার ওপর সামরিক হামলা নামিয়ে আনছে। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, পশ্চিম দুনিয়ার, বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থন ছাড়া তার পক্ষে বারবারই এই সামরিক অভিযান চালানো সম্ভব নয়।

মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ন্ত্রণ কায়েমে ইজরায়েলই মার্কিনের সবচেয়ে বড় মিত্রশক্তি, আর তার এই রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকেই সে ইজরায়েলের সামরিক আগ্রাসনে সক্রিয় মদত যুগিয়ে চলে। এবারের হামলা শুরু হওয়ার পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা ইজরয়েলের পাশে থাকার বরাবরের প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং এর সাথেই আরও বলেছেন—যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে আমেরিকা ইচ্ছুক। কিন্তু 'ইচ্ছা' বাসনার মধ্যেই আটকে থাকছে, তার বাস্তবায়নে কোন সক্রিয় পদক্ষেপ সে নিচ্ছে না যা ইজরায়েলের কাছে প্রশ্রয়ের সুনির্দিষ্ট সংকেত রূপে পৌঁছাচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ অবশেষে তাদের বৈঠক করতে সক্ষম হয়েছে এবং ইজরায়েলকে হামলা থামাতে অনুরোধ করেছে আর হামাসকেও সংযত হতে বলেছে। কিন্তু ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলে দিয়েছেন, 'কোন আন্তর্জাতিক চাপই' তাদের পূর্ণ শক্তিতে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারবে না। গাজা এখন ভয়াবহ মানসিক সংকটের মধ্যে, হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে গাজার সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধেই ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু করেছে। ইজরায়েলকে এখনই থামাতে না পারলে চলতে থাকবে আরও হত্যা, বইবে আরও রক্তস্রোত, সংঘটিত হবে আরও ধ্বংস। একমাত্র আন্তর্জাতিক জনমতের চাপই তার হামলা থেকে ইজরায়েলকে নিবৃত্ত করতে পারবে, আর তাই ইজরায়েলের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের জনগণকে সোচ্চার হতে হবে। প্যালেস্তাইনের এই সংকট নিয়ে ভারত সরকারের নীরবতা লক্ষণীয়। ইজরায়েলকে তার মতাদর্শগত মিত্র মনে করে মোদী সরকার মৌনতার মাধ্যমে এই আগ্রাসনে মদত দিয়ে চলেছে এটা ভারতীয় জনগণের আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক জনমতেরও বিরোধী। ইজরায়েলি সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠানোর সাথে সাথে ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আমাদের দাবি তুলতে হবে—প্যালেস্তাইনের জনগণের পাশে দাঁড়াও, ইজরায়েলি হামলার নিন্দা কর, ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা ছিন্ন কর, ইজরায়েলের কাছ থেকে অস্ত্র কেনা বন্ধ কর।

আঞ্চলিক দেশগুলোর যৌথ বিবৃতি

গাজার ওপর আগ্রাসন বন্ধ কর

গত এক সপ্তাহ ধরে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজা ভূখণ্ডের ওপর তাদের আগ্রাসন বাড়িয়ে চলেছে। ইজরায়েলি যুদ্ধ বিমানগুলো বসতবাড়ি, নাগরিক অধ্যুষিত এলাকা এবং নাগরিক পরিষেবা সরবরাহের কেন্দ্রগুলোর ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে চলেছে। প্রাক্ সতর্কতা জারি ছাড়াই বোমারু বিমানগুলো ঘরে নাগরিকদের উপস্থিতির মধ্যেই বোমা ফেলেছে, যার ফলে বহু প্যালেস্তিনীয় নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন।

ইজরায়েলি সরকার অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে তিন ইজরায়েলি যুবকের হত্যাকে কাজে লাগিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের এবং গাজার হামাস সরকারের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী উন্মাদনাকে উসকিয়ে তুলেছে। ঐ যুবকদের কারা হত্যা করেছে তা সঠিকভাবে না জানা সত্ত্বেও এটা করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে নির্বিচার হিংসাকে উসকিয়ে তোলা হয়েছে এবং এক প্যালেস্তিনীয় যুবকের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। গাজার নাগরিকদের ওপর নামিয়ে আনা হয়েছে ব্যাপক প্রতিশোধমূলক হিংসা। গণশাস্তি প্রদান আন্তর্জাতিক মানবিকতাবাদী আইনের বিরোধী।

ইজরায়েলি বাহিনী যে নির্মম হামলা নামিয়েছে তার সঙ্গে ''আত্মরক্ষার'' কোন সম্পর্ক নেই, এটা গাজার ওপর গণহত্যাবাদী হামলা এবং পালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত নির্যাতনের তীব্রতা বৃদ্ধি, যে প্যালেস্তিনীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জায়নবাদী সরকারগুলোর হাতে ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত হয়ে এসেছে।

নিম্নলিখিত সংগঠনগুলো ঃ

(১) প্যালেস্তাইনের গাজার ওপর ইজরায়েলের সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা করছে এবং অবিলম্বে ঐ হামলা বন্ধের দাবি জানাচ্ছে; রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাশ হওয়া ২৪২ নং প্রস্তাব সহ আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার দাবিও ইজরায়েলের কাছে জানাচ্ছে, যে প্রস্তাব অনুযায়ি গাজা ভূখণ্ড, ওয়েস্টব্যাঙ্ক এবং পূর্ব জেরুজালেম থেকে ইজরায়েলকে সরে আসতে হবে, যে এলাকাগুলো ইজরায়েল ১৯৬৭ সাল থেকে বেআইনিভাবে দখল করে আছে।

(২) ইজরায়েল থেকে রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করে নেওয়া, তার সঙ্গে কূটনৈতিক এবং সামরিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান সমস্ত দেশের সরকারের কাছে জানাচ্ছে।

(৩) ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট, সেখানে কোন বিনিয়োগ না করা এবং তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করার আহ্বানও জানাচ্ছে।

স্বাক্ষরকারি সংগঠনসমূহ—

সোশ্যালিস্ট অ্যালয়েন্স, অস্ট্রেলিয়া
সোশ্যালিস্ট পার্টি অফ মালয়েশিয়া, মালয়েশিয়া
পার্তিডো লাকাস এনজি মাসা, ফিলিপাইনস্
সোশ্যালিস্ট আওতেয়ারোয়া, নিউজিল্যাণ্ড
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) লিবারেশন
পার্তাই রাকায়াত পেকেরজা, ইন্দোনেশিয়া
সোশ্যালিস্ট অলটারনেটিভ, অস্ট্রেলিয়া
পার্তাই রাকায়াত ডেমোক্রেটিক, ইন্দোনেশিয়া
সলিডারিটি, অস্ট্রেলিয়া
আওয়ামি ওয়ার্কার্স পার্টি, পাকিস্তান
ফাইটব্যাক, আওতেয়ারোয়া, নিউজিল্যাণ্ড

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com